

পুড়ো লেখাটি মন দিয়ে না পড়ে কেউ কোন মন্তব্য
করবেননা দয়া করে।

সত্য আর মিথ্যার লড়াইয়ে:

সত্য আসলে কোনটি! - ০১

oo

- শুভ সরকার

আমরা কি সত্যকেই সত্য বলে জানি! নাকি
মিথ্যকেও সত্য জেনে সারা জীবন সেই মিথ্যকেই
সত্য বানানোর কাজে নিজের এবং পরিবার ও
অপরিবার সবার জীবন ব্যয় করে চলেছি! যদি
আপনি ভাবেন জীবনের এবং শুধু মাত্র জীবনের
নয় সময়ের প্রতিটি পলের অনেক মূল্য তাহলে
তেবে দেখুনতো সে ক্ষেত্রে আপনার সময়ের কতটা
পলের অপচয় হচ্ছে এই ভুল চিন্তায়, মিথ্য চিন্তার,
অলীক চিন্তার, অবাস্তব চিন্তার পেছনে ছুটে! যদি

নিজের জীবনের কোন মূল্য না থাকে তাহলে
আপনি যা খুশি করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে আমার
বলার কিছু নেই, কিন্তু আমি জানি প্রত্যেকটি
মানুষ নয় শুধু প্রত্যেকটি প্রাণীই নিজের জীবনকে
সবচাইতে বেশি ভালবাসে, অনেক মূল্যবান ভাবে,
অনেক মূল্যবান করে তুলতে চায় বা পারে। তাই
আপনার জীবনেরও মূল্য অনেক। #(ডিডিও-১)

এবার আসি মূল কথায়। জানি শিরনামের এই
কথাটি, "সত্য আর মিথ্যার লড়াইয়ে: সত্য আসলে
কোনটি!" শুনলে সকলেরই মনের কোনে একটু
প্রশান্তির ভাব চলে আসে। নিজেকে অনেক পবিত্র
পবিত্র ভাবতে মনে চায়, ভাবেনও। কিন্তু একবার
কি ভেবে দেখেছেন, নিজেকে যতই পবিত্র
ভাবেননা কেন আসলে আপনি কতটুকু পবিত্র!
এখানে ধর্মীয় দৃষ্টিতে পবিত্রতার কোন মূল্য নেই।
মানুষ হিসেবে আপনার মধ্যে সত্য ও অসত্য
ফারাক কতটুকু এবং সে বিবেচনায় আপনার
পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। কতটুকু নিরঙ্গুষ
সত্য বলেন, ভাবেন, চলেন, কাজ করেন আপনি

নিজে! আপনার মা-বাবা, তার মা-বাবা, তার মা-বাবা, তার মা-বাবা অথবা তার মা-বাবা কতটা ভানতেন!

আপনি কি তেবে দেখেছেন পূর্বমহিলা বা পূর্বপুরুষের ভাবনার কোন রকম প্রভাব কি আপনার মধ্যে আছে, যা আপনাকে আজো টানা? আমি জানি বিশেষ একটি বিষয় আজো আপনাকে টানে? আর সেটি হচ্ছে ধর্ম। হ্যাঁ, এ বিষয়টিই আপনাকে মারাত্মক ভাবে টানে। আপনার শিক্ষা দিক্ষা, জ্ঞান গরিমা, বর্তমান সময়ের চলতি এসব প্রযুক্তি ব্যাবহার করার পরেও আপনাকে বিশেষকরে এই ধর্মটাই টানে! তো আপনি কি তেবে দেখেছেন এইবিষয়টির কারনে আপনি ১৪০০ থেকে ৫৫০০ বছর পিছনে চলে যেতে বাধ্য। অথচ ১৪০০ থেকে ৫৫০০ বছর পিছনে এই সময়ের লোকদের অন্যান্য আচরণ কিন্তু আপনি এখন মেনে নিতে পারেবেননা, আমি বলবো পরিপালন করতে পারেন না। কারণ এখনকার সমাজ অনেকটাই বদলে গেছে,

পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাহলে কি আমরা বলবো
তারা বা তাদের আচরন অত্যন্ত খারাপ ছিল?
নাকি ভালো ছিলো? তবে এখনকার গোটা
পৃথিবীর মানুষের যত আচরন তার সব না হলেও
অনেক আচরন কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত। বিজ্ঞান
শিখুক বা না শিখুক সে আচরনটিকে কিন্তু শিখে
নিয়েছে। আর আচরনটি শিখে নিয়ে সে কিন্তু
প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের কাছে বস্যতা স্বীকার করে
নিয়েছে, বাস্তবে সে যতই বিজ্ঞান বিরোধী হোক বা
না হোক। ধরুন আপনি কি মেশিনে না ছেটে চাল,
গম, ভুট্টা, ঘব, ডাল, তেল ইত্যাকার যাবতীয়
জিনিসগুলো গ্রহণ করেন! আপনি কি কোথাও
যাওয়া প্রয়োজন হলে গারি, ট্রেন, নৌকা, লঞ্চ,

ইস্টিমার, বিমান হত্যাদি যানবাহনতো ব্যবহার
করেনই রাস্তা-ঘাটও ব্যবহার করেন। শুধু মাত্র
বিদ্যুৎ, হ্যাঁ, বিদ্যুৎ ছাড়া এখনকার সময়ে কে
জীবনটাকে চালায় বলতে পারবেন! আমরা কি
এখন আর প্রকৃতিতে যে পানিকে পাওয়া যায়
সরাসরি এপানিটি পানকরি! সমগ্র পৃথিবীর মানুষ

যে পানিকে পান করে তা কি বিজ্ঞানের অবদান
ছাড়া মাটির নিচ থেকে তোলা বা বাইরের পানিকে
পরিশুম্বন্দ করা কি সম্ভব ছিলো! আপনি এইয়ে
জুতা বা সেন্ডেলটি পায়ে পড়েছেন তা তৈরি করা
কি বিজ্ঞান ছাড়া সম্ভব হতো! মোবাইল ফোন,
টিভি, কম্পিউটার, ফ্রিজ, মাইক, সাউন্ড সিস্টেম
হ্যানা-ত্যানা আরো যে কতকি আবিষ্কৃত হয়েছে
এবং মানুষ ব্যবহার করছে তার কোন ইয়ত্ব নেই।

পুরো পৃথিবীর দিকে মনে মনে একটু তাকানতো।
তার আগে অবশ্য আপনাকে জেনে নিতে হবে
পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, কেন ঘটছে, কিভাবে
ঘটছে, এ ঘটনা ঘটার পিছনের তাৎপর্যই কি? এ
ঘটনা ঘটার পরের মানুষের মধ্যে কি কি প্রভাব
পড়ছে ও পরিবর্তন ঘটছে। এগুলো যথা সম্ভব
আপনাকে জেনে নিতে হবে।

আমি জানি আপনি চেষ্টা করেন সব বিষয়ে
ঘাটতে, দেখতে, জানতে, বোঝাতে। তাহলে এবার
সব বিষয়গুলোকে মনের পর্দায় এক করুনতো।

একটু মিলিয়ে দেখুনতো কোথাকার কোন ঘটনাটি
সত্যিকার অথেই ভাল ঘটছে। কোন ঘটনাটি
মানুষের জন্য আসলেই উপযোগি! আর কোন
ঘটনাটি মানুষের জন্য মোটেও উপযোগি নয়!

একটু মানব সভ্যতার দিকে তাকানতো। এয়াবৎ
মানুষের ইতিহাসে যা যা ঘটেছে তার মধ্যে কোন
ঘটনাটির প্রভাব প্রকৃত পক্ষে এখনো মানুষের
উপকার করছে। মানুষের মধ্যে এমন অনেক
ঘটনাই ঘটেছে যা মানুষের কোন উপকারই
কারছেনা, হয়তো ক্ষতি করছে।

আচ্ছা বলুনতো, এতসব ঘটনা দেখার পর
আপনার কি একবারও মনে হয়না আমরা গোটা
মানব সমাজ প্রকৃতপক্ষে এখনো সত্যিকারের
সত্যিটাকে ঐভাবে গ্রহন করতেই শিখিনি। আমরা
নিজেদেরকে যতই জ্ঞানী বলি না কেন, মূলত
আমরা এখনো অ-জ্ঞানী বা নির্বোধ রয়ে গেছি!
অনন্তকাল ধরেই আমরা নির্বোধ! সত্য আর
মিথ্যের আমরা মোটেই ফারাক করতে পারিনা।

সত্যি কথা কেউ যখন বলে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা
কেউ তা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করিনা। যে বলে সে
আমাদের এই সমাজের লোক বলেই হয়তো কারো
কাছ থেকে কোন নতুন কিছু দেখলে আমরা খেপে
যাই, আশাও করিনা কেউ নতুন কিছু বলুক।
বিশ্বাষও করিনা যে কেউ নতুন কিছু বলতে পারে।
আমরা যে যত নতুনের কথাই বলিনা কেন, যে যত
নতুনের গুণগান গাইনা কেন, তা মূলত লোক
দেখানো, ঠাট বজায় রাখার জন্য, ধাচ্চে উঠার
চেষ্টা মাত্র। মূলত আমরা সব সময় প্রচলিত কথা
শুনতেই বেশি এবং সবচাইতে বেশি পছল করি।
আমরা মনে করি পুরাতন কথাই স্বত্স্বীন্দ্র, সত্যি
এবং চিরন্তন সুন্দর। আমরা কখনো ভেবে দেখিনা
যে চিরন্তন সত্যি বলতে মূলত কিছু নেই, কখনো
ছিলওনা, আর থাকবেওনা কোনদিন! যদিও
মৌলিক পদার্থগুলোকে পার্থীর সত্য বলে মনে হয়
কিন্তু সেই মৌলিক পদার্থের মৌলিকতা নিয়েও
টানা হ্যাচরা আছে বলেই মনে হয়। কারন ঐ
পদার্থেরও সৃষ্টির ব্যাপাটিতো আবার ধর্ম
প্রবর্তকদের ও তাদের চেলাদের মাথায়ই ঢেকে

না। ওনারাতো নিজেদের অবস্থানটি এমন করে
নিয়েছেন যাতে এসব জ্ঞানের আদৌও কোন
জায়গাই নেই। এসব জ্ঞান যারা অর্জন করে
তাদেরকেইতো ওরা সহ্য করতে পারেনা। নিজেকে
দিয়েই ভাবুন না কেন, আপনি যদি শিক্ষিত হন
পায়ের নিচে পরা কাগজে লেখা শব্দটুকুও আপনি
বুঝবেন। আর যদি মুখ্য হন চোখের সামনে টানিয়ে
রাখলেও পড়ে তার অর্থ বেড় করা সম্ভব হবেনা।
এখন বিজ্ঞানের অনেক বড় একটি আবিষ্কার
সম্পর্কে একটু বলবো আমার এ কথার উদাহরণ
দেবার জন্য। আমি জানি এসব বোঝা কোন
ধর্মীকের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি বুঝতে পারে তাহলে
বলতে হবে সে এক ধর্মীক। সে গাছেরও খায়,
আবার তলারও কুড়ায়। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে
পারবেন। তার মানে যে সব ধর্মীকেরা বিজ্ঞান
পড়ে তারাও কিন্তু প্রতারক। নিজের সাথে, নিজের
বিশ্বাসের সাথে প্রতারনা করে তারা। শুধুবা এই
বলি কেন, পড়াশোনা করার এই বৈজ্ঞানি প্রকৃয়াটি
আবিষ্কার করাটাইতো একটি বড় বৈজ্ঞানিক
আবিষ্কার। তারাও এই প্রকৃয়াটিতেই শিক্ষা দেয়

তবে বহু বহু আগে আবিষ্কৃত প্রকৃয়ায় কতগুলো
ভান্ত ধারনা মানুষের মনে চুকিয়ে দেয়। এখনকার
পৃথীবিতে আধুনিক প্রকৃয়া ছাড়া শিক্ষা কোন
শিক্ষাইনা। ওসব আন্ত্যাবলের বস্তা পঁচা সন্তা বুলি
মানুষের মনে চুকিয়ে প্রকৃতপক্ষে মনুষকে
বিপথগামী করা হয়। যেমন ধরুন -

আমরা ফোটনের মত ভরহীন কণার কথা জানি
যারা আলোর বেগে ছোট। পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা
কে এক সময় বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছিলেন
পরমাণু। যাকে প্রাথমিক কণাও বলা হত। কিন্তু
আজ আমরা জানি যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা
পরমাণু নয়। কারন, পরমাণু কেও ভাঙ্গা সম্ভব।
পরমাণু কে ভাঙ্গলে আমরা পাব একটি
নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস এর চারদিকে
আবর্তনরত ইলেকট্রন। আর নিউক্লিয়াস গঠিত
হয় প্রোটোন ও নিউট্রন এর সমষ্টিয়ে। বহুদিন
ধরেই ইলেকট্রন, প্রোটন, আর নিউট্রন কে
প্রাথমিক কণিকা মনে করা হত। কিন্তু পরবর্তীতে
আমরা জানতে পারলাম যে, প্রোটন ও নিউট্রন

আরো অনেক ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিয়ে গঠিত যাব
নাম হল কোয়ার্ক। যাহোক, আমরা জানতে
পারলাম যে পদার্থ ভেঙে অনু আবার অনু ভেঙে
পরমাণু এবং পরমাণু ভাসলে পাচ্ছি ইলেকট্রন
আর নিউক্লিয়াস। এরপর নিউক্লিয়াস কে ভাসলে
পাচ্ছি প্রোটন আর নিউট্রন। শুধু ইলেকট্রন বাদে
প্রোটন আর নিউট্রন কে ভাসলে আমরা পাব
কোয়ার্ক। এখন পর্যন্ত কোয়ার্ক হল প্রাথমিক
কণিকা। এখানে ই শেষ নয়, খেলা শুরু কেবল।
এই কোয়ার্ক গুলো আবার বিভিন্ন রূপে আছে।
প্রায় ছয় ধরনের কোয়ার্ক আছে।

1. আপ কোয়ার্ক
- 2, ডাউন কোয়ার্ক
- 3, চার্ম কোয়ার্ক
- 4, স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক
- 5, টপ কোয়ার্ক ও
- 6, বোটম কোয়ার্ক।

প্রোটন তৈরি হয় দুইটা আপ কোয়ার্ক আর একটা

ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে।

নিউট্রন তৈরি হয় একটা আপ আর দুইটা ডাউন
কোয়ার্ক দিয়ে।

বিজ্ঞানীরা আরো দুইটা কণিকা বের করলেন
একটি হল মিউন কণিকা আর একটি টাউ
কণিকা। আরো পাওয়া গেল নিউট্রিনো কণিকা।
এই নিউট্রিনো কণিকা আবার তিন ধরনের
ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউন নিউট্রিনো, টাউ
নিউট্রিনো।

তাহলে আমরা মোট 12 ধরনের কণিকা পেলাম ।
হয় ধরনের কোয়ার্ক কণিকা, তিন ধরনের
নিউট্রিনো কণিকা এবং বাকি তিন ধরনের কণিকা
হল ইলেকট্রন, মিউন আর টাউ ।

এরা সবাই প্রাথমিক কণিকা। আমাদের দৃশ্যমান
জগতের যাবতীয় বস্তু এই বার ধরনের প্রাথমিক
কণিকা দ্বারা তৈরি হয়েছে। আর এইসব কথা যারা
না বোঝে অথবা বুঝেও না নাবুঝের মতো অভিনয়

করে কিছু অপ্রয়োজনীয় কথা যা অন্যের তৈরি
করা বলে চালিয়ে যায় এবং তাদের ধারনা শুধু মাত্র

কথা দিয়েই পৃথুবি চলে। শুধু মাত্র কথা দিয়েই
একে অন্যকে আবদ্ধ করে রাখে সারাটি জীবন,
শুধুত্ব কটা কথা শিখিয়েই কিন্তু মানুষের জীবন
বিপন্ন করে কতিপয় অমানুষ, হয়ে যায় তারা
জীবন উৎসর্হকারী আত্মঘাতি টেররিস্ট। আবার
কথা শিখিয়েই কিন্তু আপনাকে তৈরি করা সম্ভব
ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানী অধ্যাপক। শুধু মাত্র
কিছু কথা শিখেছে বলেই ছোট বেলা থেকে একই
বিছানায় শুয়ে আজ শেখ মুজিব হয়েছে বঙ্গবন্ধু
আর করিম মিয়া হয়েছে বাড়ির দারোয়ান। তাই
বুঝতেই পারছেন কথার ক্ষমতা কত? কথার
ক্ষমতা কত ব্যাপক? কথার ক্ষমতা কত মারাত্মক?

তাই বলেকি আমরা কারো কোন কথাই শুনবো
না! ভেব বলুনতো! আমিতো মনে করি অন্যের
কথা না শুনে, না শিখে, না বুঝে কেউ কখনো
নিজে কথা তৈরি করতে পারেনা, পারবেওনা কোন

দিন। এই জন্যই আমরা অন্যের কথা শুনি। ব্যাপক আয়োজন করে অন্যের কথা শুনি। দেখুন একটি শিশু কিন্তু অন্যের কথা শুনে শুনেই নিজের কথা বলা, হাটা চলা, খাওয়া হাগা, পোষাক পরিচ্ছদ পড়া, আগড়ুম বাগড়ুম অনেক কিছুই শিখে নেয়। ধরুন আপনার শিশুটি যদি এমন কোন পরিবেশে বড় হতো যেখানে সবাই ইংরেজিতে কথা বলে তাহলে সে কিন্তু ইংরেজি ভাষাই শিখতো, কেউ যদি আরবি ভাষাভাষী লোকের মধ্যে বাস করতো সে আরবি ভাষাই শিখতো, কেউ হিন্দি ভাষাভাষীদের সাথে থাকলে হিন্দি বলা-ই শিখবে। আবার যদি এমন কারো নিকটে থাকতো যারা অস্ত্রবাজি, বোমাবাজি, গোলাবাজি, নোংরামি, ইতরামি, ডন্ডামি এসব করে বেড়ায়, তো আপনার সন্তানের কাছ থেকে ওর বাইড়ে ভাল কোন আচরণ আশা করা যেতনা। কেন, এইয়ে দেখেননা শিল্প সাধনা ছাড়া কারো পক্ষে কি শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব, সাহিত্য সৃষ্টির মত কাজতো শুধুমাত্র গভীর মনোযোগের সাথে সাহিত্য পড়েই করা সম্ভব। শিল্প বা সাহিত্যের সৃষ্টিতো কোন অশিল্পী বা কোন

অসাহিত্যকের কাছ থেকে আশা করা যায় না।
আর যদি তা হয়ও তা আমার মনে হয়
অগ্রহনযোগ্য শিল্প বা সাহিত্যেরই সৃষ্টি হবে, বইতে
নয়। অথবা গ্রহণযোগ্য হলেও সেটা হবে
কাকতালিয়, অনেকটা আচানক ব্যাপার, যেন
গোবরে পদ্মফুল। আর আমাদের এই সত্যকে
মেনে না নেয়ার বা মিথ্যাকে প্রশংসন দেয়ারমত
একটি খারাপ স্বভাব ধীরে ধীরে আমাদের
আচরণকে অধীক্ষণ কঠোর করে দেয়।

বলুনতো প্রাণীজগৎ না, শুধু প্রানীজগত নয়, এই
বিশাল জীবজগৎ বাতাস থেকে শুধুমাত্র
অক্ষিজেন বেঁচে থাকে, অক্ষিজেন ছাড়া বাঁচতে
পারেনা -এটা পৃথিবীর একটি ধর্মীয় গ্রন্থেও বলা
নেই! কেন বলা নেই জানেন? কারন ধর্মগুলো
যখন তৈরি হয়েছে তখন মানুষ বায়ু চিনত কিন্তু
বায়ুর মধ্যে যে অক্ষিজেন নামক একটি জিনিস
আছে সেটা জানতো না। আর এটা আবিষ্কার
হয়েছে হাতে গোনা কয়েক বছর আগে। এখন
আপনি বলুনতো অক্ষিজেন ছাড়া কেউ যে বাঁচেনা

একথাটি অবিশ্বাস করা লোকেদেরকে আপনি
কিভাবে দেখেন? মানুষরূপ? নাকি বন্ধ বোকা
রূপে? আমি বলি, মানুষ জন্ম নেয় জীব রূপে,
আস্তে আস্তে সে অনেক কিছু শিখে শিখে মানুষ
হয়ে ওঠে। আর এই শিক্ষার যাদের ঘটতি থাকে
তারা হয় পোয়া মানব, অর্ধ মানব। তবে মানুষের
অর্জিত জ্ঞানের চাইতেতো বেশি জ্ঞান অন্যের কাছ
থেকে পাওয়া সম্ভবনা, তাই অন্তত চেষ্টা করতে
হবে যেটুকুই জ্ঞান পাওয়া যায় সেটুকুই যেন যথা
সম্ভব শুন্ধ ও পরিশুন্ধ জ্ঞান হয়। অপশিক্ষা যেন
আমাদের মধ্যে না ছড়িয়ে যায়। কিন্তু এদেশে
বাস্তবে ঘটছে একাজটাই বেশি। এদেশ শেষ হয়ে
যাচ্ছে এই অপশিক্ষার কষাঘাতেই। একটু ভেবে
দেখুন।

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিস্টলি
আবিষ্কার করেন প্রাণীদের অক্সিজেন গ্রহণ করে
বাঁচতে হয়। এর আগে কেউ যদি একবার একটু
বলতে পারতো একথাটি মানুষের কতইনা উপকার
হতো! মানুষ তাকে দেবতা বানিয়ে মাথায় করে

নাচতো। কিন্তু কেউ তা পারেনি। অথচ এখনকার সময়ে কেউ কি আছে যে এ বিষয়টিকে অস্বীকার করবে, অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রনী বাঁচে বলে প্রমান করতে পারবে? এখন ঘোড় ধর্মীক ব্যাক্তিটি বিশ্বাষ করে এ বিজ্ঞানটিকে। কারন এখন এরা দেখে ফেলেছে যে নাক বা মুখ দিয়ে বাতাস নাঢ়কলে আসলেই কোন জীবিত প্রনীকে আর জীবিত পাওয়া যায়না। সে মরে যায়। তাই এক্ষেত্রে আর তাদের ধর্মীয় জাড়িজুড়ি আর কোন কাজই করেনা।

বিজ্ঞানের একটি আবিষ্কার ধর্ম ও দর্শনের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দিল। আত্মা, পরমাত্মা, আত্মার অমরতা জাতীয় দার্শনিক কথাবার্তা এরপর বাতিল হয়ে গেলো। কারণ আত্মা বলতে কিছু থাকলে সেটা অক্সিজেনের জন্য ছটফট করত না। জলের তলায় গিয়ে দম বন্ধ করে থাকতে হত না। আত্মারাম অক্সিজেনের অভাবে খাঁচা ছেড়ে পালাবে কেন? সে তো অমর!

এসব বাদ দিন, কি করে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন তৈরি করে সিলিন্ডারে ডরে রাখা যায় সে কথা "বিজ্ঞানময় কিতাবেও" বলা নেই! থাকবে কি করে অক্সিজেন তো এই সেদিন আবিষ্কার হলো ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে!

তবে যারা এই সত্যকে এইরূপ সত্য বলে প্রকাশ করে তাদের প্রয়োজন কঠোর মনোনিবেশ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা তারপর ফলপ্রকাশ। কিন্তু এ ফলটি যদি প্রচলিত আপাত স্বত্সিদ্ধ ভাবা কোন কথার উল্টো হয় তাহলেইতো বিপদ, তাহলেই আর রক্ষে নেই, তাহলেইতো সে সত্য বলার গলা ওমনি মটকে দেয়া হবে - জ্ঞতে বা অজ্ঞাতে, চেতনে বা অবচেতনে, লিগ্যালি বা ইলিগ্যালি, স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। হতে পারে চিরতরে স্তুত্ব করে দেয়া হবে এ কষ্ট, চিরতরে, হ্যাঁ।

আর তাই দেখা যায় পার্থীর জীবনে সত্য বলার বিপদ অনেক। যদিও পার্থীর জীবনটাই কিন্তু একমাত্র জীবন, অপার্থীর কোন জীবন নেই। আর এ জীবনে যারাই এবং যখনই সত্যটি বলেছে বা

প্রকাশ করেছে তাদেরই বিপদে পরতে হয়েছে। ছোট খাট বিপদ নয়, সমুহ বিপদ, বেঁচে না থাকা বা মরে যাবার মতো বিপদ। আজকের বাংলাদেশেতো এটি আরোও প্রকটভাবে সত্য। প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংসাত্ত্বক সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ডয় পাওয়ার যথেষ্ট কারন আছে। তারপরও জগৎ জুড়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বাধীনভাবে তাদের মত ও বক্তব্য প্রকাশ করতেই চান; স্বাধীনভাবে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন, দ্বিধাষ্ঠীত হন না। এবং আমি খুব জোড়দিয়ে বলবো, তাদের এই চেষ্টার ফলেই সমাজ আজ এতদূর এগিয়েছে বা এতটুকু এগিয়েছে। আরো অনেকদূর এগোবার কথা ভাবা যেত যদি ধর্মান্ধতা ঐসব মুক্তচিন্তক মানুষের পেছনে এভাবে না লাগতো। সমাজ আরো অনেক আগেই আরোবাহ্দূর এগুতে পারতো যতদূর এখন পর্যন্ত এগুতে পেরেছে তার থেকে। ঐসমস্ত চিন্তাশীল মানুষেরা নিজের জীবন বিপন্ন করেও তাদের সেই বিবেকের তাগিদেই প্রকাশ করেছে সত্য কথাটি। আসুন একটু ইতিহাস দেখি, প্রাচীন গ্রীক কবি ইউরিপিডিসের (৪৮০ - ৪০৬ খ্রি. পূ.)

একটি বাণীতে পাওয়া যায়,

'Honest words should not be hushed up:
let everyone hear'।

বহু শতাব্দী আগে ইবনে রুশদ, সম্ভবত ইসলামী জগতের প্রথম দার্শনিক যিনি মুক্তবুদ্ধি নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কথা বলতেন। যার জন্ম গ্যালিলিওর বহু পূর্বে, তাকে মুক্তবুদ্ধি চর্চার জন্য নির্যাতিত হতে হয়েছিল। নিজ বাসভূমি থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল, বিচারের নামে প্রহসন সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে তোবা করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাকেও পরবর্তীকালে গাজ্জালীর অনুসারীরা আরবীয় নামের কারন বলেই তাঁর দর্শন না বুঝেই ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম বানানোর চেষ্টা করেছিল। অথচ ইবনে রুশদ প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাছাড়া ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ওমর খেয়াম, আল-বেরুনী অনেককেই পলাতক জীবন জাপন করতে হয়েছিল সেই সময়েও শুধুমাত্র প্রচলিত সত্যকে স্বীকার না করার জন্য। যিরহাম, আল দিমিস্কি কেতো মৃত্যুবরন করতে হয়েছে।

ধর্মবিরোধী বলে নিল্দিত ও গেঁড়াপন্থীদের হাতে
নিগৃহিত হয়েও মুক্তবুদ্ধির চিঞ্চা-চেতনা প্রচারনায়
থেমে যাননি প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী মোহাম্মদ
বিন জাকারিয়া আল-রাজী।

সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ সব গ্রহ -
এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধারন ও লালন করার
অপরাধে ইতালীর বিজ্ঞানী জিয়োর্দানো ক্রনোকে
সহ্য করতে হয়েছে দীর্ঘ আট বছরের নির্যাতমূলক
কারাদণ্ড। ধর্মান্ধ মানুষ, ধর্মঘাজকবৃন্দ আর
জগতগুরু পোপ ক্ষিপ্ত হলেও ক্রনো সত্যকে ত্যাগ
করেননি। তারপর চরম দণ্ড হিসেবে ১৬০০
খ্রিস্টাব্দে পবিত্র গ্রন্থবিরোধী মতবাদ লালন করার
জন্য তাঁকে পুরিয়ে মারা হলো। কিন্তু আপনারা
এখন কি জানেন, পৃথিবী কি সূর্যের চারিদিকে
ঘোরে, না সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে? নাকি
পৃথিবী স্থীর, এবং কেউ বা কারা সূর্যকে টেনে নিয়ে
যায়! ক্রনোর দ্বাবীকৃত সত্যটিইতো প্রতিষ্ঠিত
হলো! এখন যদি কেউ বলে সূর্য পৃথিবীর
চারিদিকে ঘোরে তাহলে আপনার পঞ্চম শ্রেণিতে

পড়ুয়া বাচ্চাটিও আপনার দিকে বিশ্বয়ের দৃষ্টিতে
তাকবে। ভাববে আমার বাবা বা মা কি পাগল হয়ে
গেল!

গ্যালেলি ও গ্যলেলি'র কাহিনী আমরা সবাই জানি,
প্রথমে কোপার্নিকাস, পরে গ্যালেলি ও সৌরজগৎ
সম্পর্কে মানুষের ধারনাই বদলে দিয়েছেন। ধর্মীয়
বিচারালয় তাই গ্রেফতার করেছে গ্যালেলিওকে,
তাঁকে জন্মনা দিয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য
করেছে এই ঘোষনা দিতে যে তার ধারণা ভুল এবং
তাই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর তত্ত্ব প্রত্যাহার করে
নিচ্ছেন। তবু সূর্য ঘোরনি পৃথিবীর চারপাশে। এবং
এসব ধার্মীকেরা এখন সবাই এটা বিশ্বাষ করে যে
পৃথিবী আসলেই সূর্যের চারিপাশে ঘুড়ছে। যদিও
তাদের ধর্মীয় ধারনাটিও তাদের মাথায় আছে।
ধর্মীয় ধারনা মাথায় রেখে ধর্মের বাইরের কোন
কথাকে বাস্তব জীবনে বিশ্বাষ করা কি করে সন্তুষ্ট
আমি বুঝিনা! অথচ আজ পর্যন্ত এ কাজটিই করে
যাচ্ছে সব ধর্মের ধর্মীকেরা।

ঈশ্বর পুত্রের জন্মের প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে
আনাক্তগোরাস চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
প্রদান করেছিলেন, বলেছিলেন চাদের নিজের
কোন আলো নেই; চাদের ওপর পৃথিবীর ছায়া
পড়ার কারনে চন্দ্র গ্রহন ঘটে। পবিত্র গ্রন্থবিরোধী
এই মতবাদ প্রচারের জন্য এই মহান বিজ্ঞানীকে
দীর্ঘদিন নিষ্ঠুর নির্যাতন করে দেশ থেকে বিতারিত
করা হয়। কিন্তু পবিত্র গ্রন্থের বানী আজ এ সমাজে
কতটুকু টিকেছে! আপনার আমার কাছে কতটুকু
টিকেছে! আজ কি আমরা চন্দ্র গ্রহন হলে খোল
করতাল নিয়ে বেড়িয়ে পরি? কেন করি না! নাকি
সজতনে বাদ দিয়েছি এসব ধর্মীয় অপব্যুক্তিকে?

ষোড়শ শতকে সুইজারল্যন্ডের বেসেল
বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যপক
প্যারাসেলসাস গবেষণার মাধ্যমে দেখলেন যে,
রোগের পিছনে রয়েছে শরীরের মধ্যে বাসা বাঁধা
বিশেষ ধরনের রোগ জীবানু। পরজীবী এই
জীবানুদের ধ্বংস করলেই রোগ থেকে মুক্তি
পাওয়া যায়। অতচ ধর্ম বলে পাপের ফলে বা কোন

অজ্ঞাত শক্তি রোগের জন্য দায়ী। পবিত্র গ্রন্থের
বাইরে কথা বলার অজুহাতে তিনি দোষি হলেন,
তিনি বিচারের সম্মুখিন হলেন ধর্মবিরোধী মত
প্রচারের জন্য। তাকেও মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হলো।
অধ্যাপক পালিয়ে শেষে জীবন রক্ষা করলেন।
আর আজ দেখছি করোনা ভাইরাসের পেছনে
পরেছেন পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীরা।
অথচ যে এই তত্ত্বটির আবিষ্কার করলো তাকে
ফেরার হয়ে জীবন বাঁচাতে হলো। হায়রে ধর্মীয়
ধ্যান ধারনা! হায়রে ধর্মীয় বিশ্বাষ! কত নির্মম তোর
ইতিহাস! কত উদ্ভ্রূত, উজঘুটে, কত
কিন্তুত্কিমাকার তোর আচরন!

আমরা প্রায় সবাই জানি, এমনকি ঘোর ধর্মীক
লোকটি পর্যন্ত যানে যে বাঁচতে হলে করোনা
কালীন যে কয়টি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা
হচ্ছে তার সব কয়টাই আমাদেরকে মানতে হবে।
এবং যথা সময়ে টিকাটিও নিতে হবে। অথচ
ধর্মতো বলেছে অন্য কথা, যেই কথার জন্য এই
তত্ত্বটি অর্থৎ টিকা নিতে হবে এই কথাটি যে

উদ্ভাবন করলো তাকে আইনের আওতায় এনে
তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষনা করা হলো, তাহলে আমরা
কি ধরনের লোকেরা এই দেশে বাস করেছি তখন!
যখন মহাবিজ্ঞানিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে
হয়েছে! অথচ আজওতো তার আবিষ্কারটি
প্রত্যেকটি লোক নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি
করছে। আজ আর কাউকে বলে দিতে হয়না যে
টিকা না নিলে নির্ধাত মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা
করছে। কারন সে নিজেও দেখছে প্রায় একান্ন
লক্ষ মানুষই এর মধ্যে নাই হয়ে গেছে। আর
আক্রান্ত হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটির মত। এই
ধন্কায়ই মানুষ বুঝে গেছে যে প্যারাসেলসাস কোন
হাস্যকর ব্যক্তি নয়, তখন উনাকে আত্ম হত্যারমত
স্বাস্তি দিলেও এখন ওনার কথাকে মানতে পৃথীবির
প্রায় প্রতয়েকটি লোক এক কথায় বাধ্য হচ্ছে।
তবে বিজ্ঞানের এত সব মতকে স্বীকার করে
নিলেও কিন্তু উনারা ধর্মীক! ধর্মীক নয় শুধু
মহাধর্মীক। অথচ ধর্মের গোরার কথাইতো
বিজ্ঞানকে মানলে আর ঠিক থাকেনা, সেই
বিজ্ঞানকেইতো অস্বিকার করেছেন আপনি, আর

প্যারাসেলসাসওতো ধর্মের বিপরীত কাজটি করে ছিলেন। জানি এখন উনারা বলবেন, "কে বলেছে গোরার কথা? এটা কোন ধর্মোর গোরার কথা নয়।" আমি তাদেরকে বলবো, "তাহলে এতজন মানুষকে প্রান দিতে হলো কেন? না, এরা শুধু মানুষনা, এরা অনেকটা অতি মানব ছিলেন। কারণ এরা যেসব আবিষ্কার করেছেন তা সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এবং এরা বেঁচে থাকলে ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মানুষকে হয়তো আরো অনোক কিছু আবিষ্কার করে দিয়ে যেতে পারতেন।

আর এখনকার সমাজ নিয়ে যারা ভাবেন তাদের মধ্যেও একই ধরনের ব্যাদনা, একই ধরনের আক্ষেপ শোনা যায়। তাহলে সমাজের কী পরিবর্তন হলো! আসলেই কি সমাজের কোন পরিবর্তন হয়েছে!

বাসিয়ক দিক থেকে সমাজে যা দেখা যায় তাতে মনে হতেই পারে যে সমাজ অনেক পরিবর্তিত

হয়েছে। আসলেই কি তাই? আসলেই কি পরিবর্তন
এসেছে সমাজে? আমি বলবো, আমি না শুধু
আপনারাও বলবেন, আসলে দু'পক্ষই সমাজে
বেড়েছে। প্রথমত যারা নিজেরা কঠোর পরিশ্রম
করে বা মস্তিষ্ক খাটিয়ে যা কিছু বেড় করছে বা
আবিষ্কার করেছে, সমাজকে সেই প্রকৃত সত্যটির
স্বাদ নিচ্ছে। দ্বিতীয়ত সমাজে এই প্রকৃতপক্ষে কিছু
না জানা অথচ সবজাত্তার ভাবধড়া ভদ্ররাও প্রকট
হচ্ছে, প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এবং এইসব
ভদ্ররাও কিন্তু এইসব সত্যের স্বাদ নেয়া থেকে দূরে
থাকছে না। উরাও এই স্বাদটিকে ভাল ভাবেই
নিচ্ছে, শুধু মুখে বলছে ধর্মের কথা, বিশ্বাষের ভয়ে।

তবে হাস্যকর কথাটি হচ্ছে, মানুষের সমাজ
স্বীকার করুক বা নাই করুক সে কিন্তু ধীরে ধীরে
একসময় এই বোদ্ধা লোকের উদ্ভাবনটিকেই মেনে
নিতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এক দুই জন করতে
করতে সবাই একসময় জানতে পারছে বিশেষ
কোন উদ্ভাবনের গুন সম্পর্কে। চিরকাল হবেও
তাই। এবং চিরকাল মানুষ মনেও রাখবে তাই। মনে

রাখতে না চাইলেও বাধ্য হয়েই মনে রাখতে হবে।
বর্তমান সময়ের বোন্দাদের মধ্যে আবার একটি
প্রকট অংশ আছে যারা নিজের চিন্তা চেতনাকে
প্রকাশ করতে যথেষ্ট ভয় পান। সেইসব বোন্দাদের
উদ্যেশ্যে একটি কথা না বললেই নয়, আর তা
হলো, যারা ভয় পান চিন্তারাজীকে, সত্যকে
অপকর্তৃ প্রকাশ করতে, ঐসব আক্রমনের ভয়ে
আমি তাদেরক বলবো, চিন্তারাজীকে লুকিয়ে
রাখার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই। আর তাদের চিন্তা
রাজীকে প্রকাশ না করলে এ সমাজ ধীরে ধীরে
আন্দকারে অতলান্তে চলে যেতে বাধ্য, যাদের
চিন্তারাজীকে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ হয়, তদের
সে ধরনে চিন্তা না করাই বোধহয় ভাল। এবং
আপনারা, যারা নিজের সন্তানদেরকে
ভালোবাসেন তাদের উদ্যেশ্যে বলছি, আপনারা
নাহয় নিজের চিন্তাকে প্রকাশ না করে কষ্ট করেই
বর্তমান সময়ের চিন্তাকে মেনে নিয়ে সমাজে নাক
মুখ গুজে গা ভাসালেন! কিন্তু আপনার সন্তান,
আপরাপর মানব শিশু যারা আপনার চোখের
সামনে দিন দিন বেড়ে উঠছে তাদের জীবনটাকে

আলো দিয়ে সমৃদ্ধ করা ও তাদের জন্য একটি
সুন্দর জীবন উপহার দেয়া আপনারও কর্তব্য।
আপনার বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেছে আপনাকে
সমৃদ্ধ করতে, আপনারও উচিৎ হবে, এসব
সন্তানদের মোখের দিকে তাকিয়ে ওদেরকে সমৃদ্ধ
করা। তবে 'চিন্তার দাসত্বে'র ক্ষেত্রে যে কেবল
মৌলবাদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য তা ভেবে নিলে
কিন্তু ভুল ভাবা হবে। ভান্ত চিন্তা, কৃপমন্ত্রকৃতা আর
অন্ধবিশ্বাস কুরে কুরে খাচ্ছে এ সমাজকে,
আজকের বাংলাদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল
নামধারী বুদ্ধিজীবী সমাজেকেও।

আরেকটি কথা না বললে যে কথাটিই অসম্পূর্ণ
থেকে যাবে, আর সে কথাটি হচ্ছে, এ সমাজের
তথাকথিত ও আন্ত প্রচারিত মাথারা, অবশ্য
সমাজের মাথা হয় তারাই যারা প্রধানত লুটপাট
করে খেতে পারে, অন্তত আমাদের সমাজেতো
বটেই, তাদেরই সবাই বাধ্য হয়ে ভয় করে। আর
লোকের বাধ্য হয়ে ভয় করাকে এরা ভাবে
লোকজন তাদেরকে সমীহ করে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধা

করে, সালাম দেয়। কিন্তু মূলত তাদেরকে যে ভয় পায় সে খবরও রাখার তারা প্রয়োজন বোধ করেনা। অবশ্য এমনও আছে তারা নিজেরাও জানে তাদেরক মানুষ ভয় করে। কারন তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে আত্ম স্বার্থ ঠিক রাখার প্রয়োজনে মানুষের সাথে জঘন্ন আচরণ করেছে। অর্থৎ জঘন্ন আচরনের ইতিহাস আছে তাদের বিরুদ্ধে। সেই তারা ভাবে, "তোমার এত চিন্তা করার কি প্রয়োজন?" আর সমাজের অতি সাধারন লোকেরা ঐসব বেশি টাকাওয়ালা লোকদের ভাষাকে হ্বুহ ডুল্পিকেট করে। অবশ্য যদিও তারা একথা কোন দিনও স্বীকার করবে না যে তারা অন্যের কথাকে নিজের মুখে অনুকরণ করছে মাত্র। তাই সমাজের অতি সাধারন লোকদের মুখের ভাষাই হয়ে যায় পরে তাই। "তোমার এত চিন্তা করার কি প্রয়োজন? চিন্তা করে তুমি কি এমন বের করতে পারবা?" যা বের করা প্রয়োজন তাতো আগেই বের করে গেছে অনুকে। তাই চিন্তা করবেনা। চিন্তা করলেই তুমি একজন বিপথগামি, ফালতু, অবিবেচক, সমাজের

কাছে অনাঞ্জিত মানুষ হয়ে যাবে। শুন্দ বা অশুন্দ, কোন চিন্তারই কোন স্থান আমাদের সমাজে নেই। এমনকি দেশের প্রদানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিকেও শুন্দ চিন্তা চর্চার কোন মানুষকে আজ পর্যন্ত মর্জাদা দিতে দেখিনি। তাই সাধারণ মানুষতো শুন্দ চিন্তার কোন মর্জাদা দেবেনা এটাইতো স্বাভাবিক। মরারপরে দু'এক জনকে অবশ্য দিতে দেখা যায়।

তাই বলে কি শুন্দ চিন্তা ছেড়ে দিতে হবে? অথবা ডিন কোন সম্মান প্রপ্তির আশায় কি কেউ শুন্দ চিন্তার চর্চা করে! মোটেই না। গোটা দেশকে, গোটা জাতিকে, গোটা বিশ্বের মানুষকে আরও একধাপ এগিয়ে নেয়ার জন্য নিজের চিন্তা চেতনাকে আরও কিছুটা বড়িয়ে নেয়ার জন্য, আরও এক পশলা নতুন আলো পাবার আশায় বর্তমানে অখৃশি মানুষের দূরন্ত ছুটে চলার মাধ্যমে পথে কোন কিছুকে মিলিয়ে ফেলার ও সেই মিলাতে পারার স্বার্থকর্তাই হলো কোন কিছু আবিষ্কার। আর কোন কিছু আবিষ্কারের মধ্যেই কিন্তু তারা থেমে যায় না। তার পরেও সে চেষ্টা চলতে থাকে, এবং সেটা চলে

ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত তার ধৈর্যে কুলায় বা
তার শরীরে কুলায়।

শুন্দ চিন্তা চর্চার মানুষদের সাথ অশুন্দ চিন্তা চর্চার
মানুষের আসলে কোনটি শুন্দ চিন্তা এবং কোনটি
অশুন্দ চিন্তা এই নিয়েইতো প্রকৃত সংঘাতটি!
আসলে এই সংঘাতটিই রয়েছে পৃথীবির যাবতীয়
সংঘাতের মূলে। সংঘাতের যতই রকমফের
হোকনা কেন প্রকৃত সংঘাতটি আসলে এটাই। সেই
গুহামানবদের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত
ঘাত প্রতিঘাত আঘাত দেখবেন সবই এই শুন্দ
আর অশুন্দেরই সংঘাত। হতে পারে কখনো
বোঝার ভুলেও বা স্বার্থের প্রয়োজনে সংঘাতের
সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তাকেও কি এ বিবেচনা থেকে
বাদ দেয়া যায়! নাকি সুযোগ আছ তাকে বাদ
দেয়ার মত!

এবার আসুন ধর্মীয় মতামত মেনে যারা বিজ্ঞানকে
নিজেদের জীবনে কোন স্থান দেবেন না বলে ঠিক
করেছেন তাদেরকে একটু দেখাই ধর্ম বিজ্ঞানকে

অস্মীকার করতে পারে কিনা।

শিক্ষার সবচাইতে বড় সুফলটি হলো, শিক্ষা মানুষের আচরনকে উন্নত করতে সাহায্য করে, কিন্তু ধর্ম আচরনকে কমপক্ষে ১৪০০ বছর পিছনে টেনে নেয়। মানব সভ্যতা শুরুর এতকাল পরে এসে এখনো মনে হচ্ছে আমরা মানুষেরা এই আচরণটিতে উন্নতি না করে ক্রমস অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। শিক্ষা গ্রহনের পরেও নির্মম সত্য হলো এক সময় মানুষ সবাই মুখ্য ছিল। তাই তারা একা অনেক কিছু জানতোনা। এখন মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে। এখন প্রয়োগিক বিদ্যা থাকুক বা নাই থাকুক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মানুষ অনেককিছু আগে থেকেই জেনে যায়। কারন এখন মানুষ শিক্ষিত, মানুষের হাতে এখন বই আছে, শিক্ষা গ্রহনের অন্যান্য উপকরন আছে। বিজ্ঞান আছে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে পাওয়া প্রযুক্তি আছে, নতুন নতুন আবিষ্কারের সন্তান আছে। অথচ দেখেন এতসব কিছু থাকার পরেও, এত সুযোগ সুবিধা মানুষ ভোগ করার

পরেও, মানুষ কেন এত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধীতা করে? মানুষ এত গুঞ্জনবাজ হয় কীকরে?

এই যেমন ধরন, "আমরা বিজ্ঞান মানি না", এ ধরনের গুঞ্জন মানুষ কি করে নিজে বিশ্বাষ করে ও অপরকে বিশ্বাষ করতে বলে?

আচ্ছা, এবার তাহলে দেখি, কি কি ভাবে আমরা নিজেরা বিজ্ঞানকে গ্রহন করছি অথচ খবরও রাখছিনা যে সেটা মূলত বিজ্ঞান কি না! আসলে বিজ্ঞান হলো একটি এমন কিছু যাকে প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে শিখে নিলেই হয়, একই জীবনে বিজ্ঞানের নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে আর মানুষ নতুন নতুন জিনিস শিখে নিয়ে নিজেদেরকে আপডেটেড রাখছে।

আর ধর্ম! সেতো ধর্ম প্রবর্তকের ইচ্ছে মত কতগুলো মত বা পথকে আয়ত্ত করতে পারলেই হলো। তবে ওই ধর্ম প্রবর্তক যেই সময়ের শুধু সেই সময়ের আচরণই মানুষকে আজন্ম আয়ত্ত করতে

বলে। নচেৎ কোন মতেই চলবে না, তুমি ধর্মের
বাইরে চলে যাবে। শুধু এখানেই শেষ নয়। এর
পরেও কথা আছে- মতভেদ, দলভেদ, গোষ্ঠী ভেদ,
ধর্ম ভেদ, দেশ ভেদ প্রভিতি। পৃথিবীতে ৪২০০ টি
ধর্ম মানলেন তো সর্বপ্রথমেই মানুষকে ৪২০০ টি
ভাগে বিভক্ত করে ফেললেন। তারপর আছে
মতভেদ, দলভেদ, গোষ্ঠী ভেদ, দেশ ভেদ। কত
রকমের ভাগে যে মানুষকে, তার চিন্তা-চেতনাকে
বিভক্ত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এত রকমের
ভাগাভাগির কথা চিন্তা করতে করতে মানুষ তার
সহজ সরল মৌলিক জীবনটাকে অযথাই জটিল
করে তোলছে। অথচ এসবের কোনটিরই কোন
প্রয়োজন ছিলনা। যদি এত সব জটিল ভাবনার
মধ্যে মানুষকে ঢোকানো না হত তাহলে এতদিনে
বিজ্ঞান আরও বহুদূর এগুত।

এবার বিজ্ঞানের কথা ভাবুনতো! বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে
কী কখনো শুনেছেন বিজ্ঞান কখনো কারো মধ্যে
কোন বিভাজন সৃষ্টি করেছে! বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে
মানুষে মানুষে এত বিভেদ সৃষ্টির কোন কারণ কি

কখনো ঘটেছ, এ জীবনে শুনেছেন কখনো! এমনটি কখনো কি ঘটবে বলে আপনার মনে হয়! এখানে মনুষের জীবনের যত বেরিকেট তার সবই এসেছে আসলে এসব কুটিল ভাবনা থেকে। আপনি দেখবেন যারা কুটিল চিন্তা করে তারা যেখানেই থাকে সেখানেই কোন না কোন ক্ষেত্রে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তার কুটিল চিন্তার স্বাক্ষর রেখে যায়। অবশ্য ধর্ম প্রবর্তকদের কথা আমি কিছু বলবো না। তবে না বললেও আপনারা বুঝতেই পারবেন তাদের মন-মানসিকতা কতটুকু উচু অথবা নিচু।

সে যাই হোক, এখন সবচাইতে বেশি শোনা যায় ইসলাম ধর্মের কথা। কারণ এ ধর্মের লোকেরাই বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে সবচাইতে বেশি অপদস্ত, খুন, রাহাজানী, হত্তা, ধর্ষন, সমষ্টিগত খুন, হত্তা, ধর্ষন, হামলা, মামলা, সম্পদ হরন, ডয় দেখানো, জোড় পূর্বক কাউকে তাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজগুলো সবচেয়ে বেশি করছে। অন্যধর্ম যে একাজগুলোর বাইরে তা কিন্তু নয়। তবে

বর্তমান সময়ে অন্যান্য ধর্মগুলো এধরনের
কাজগুলো অপেক্ষাকৃত কম করছে মুসলিম ধর্মের
লোকদের চাইতে। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের
লোকেরা ইসলাম ধর্মকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক
ধর্ম বলেই দাবি করে থাকে। আমাদের জানামতে
ইসলাম ধর্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক হওয়ার কথা
যেহেতু ইসলাম ধর্মের জন্মকাল অন্যান্য ধর্মের
তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য ইসলাম ধর্মের
চেয়েও বয়সে কম এমন ধর্মও আছে কিন্তু তাদের
জনসংখ্যা অনেক কম। তাই ইসলাম ধর্ম থেকেই
উদাহরণ গুলো দিলাম। তবে আবারও আগেই
বলে নেই, অন্যান্য ধর্মগুলোও কিন্তু ইসলাম ধর্মীয়
লোকদের মত একই রকম আচরণগুলো অনেক
আগেই করে ফেলেছে। একটু ঘাটলে দেখা যায় সে
সব করুন ইতিহাস।

যে কথাটি নিয়ে কথা বলবো তা হলো
ওয়াজকারীরা বলেন, "আমরা বিজ্ঞান মানিনা"।
বিজ্ঞান মানিনা বলা যতটা সহজ না মানা কিন্তু
তারচেয়েও বেশি কঠিন। কারন বিজ্ঞান এখন

এমন হয়ে গেছে যে বিজ্ঞানকে আর না মেনে
কারো পক্ষেই সুস্থ্যভাবে বাঁচা সন্তুষ্ট নয়। বা বলা
যায়, বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া বাঁচলেও তাকে আর
কেউ মানুষ বলবে না। এ ব্যপারে পরে বলছি তবে
"আমরা বিজ্ঞান মানিনা" এ কথাটি প্রায়ই
ওয়াজকারিদেরকে বলতে শোনা যায়। এখন
দেখবো একজন ওয়াজকারী যখন "আমরা
বিজ্ঞান মানিনা" কথা বলে তখন সে নিজে কি কি
ভাবে বিজ্ঞানকে ব্যাবহার করার পরে সে বিজ্ঞান
মানে না বলছে -

১.

ওয়াজকারী যে মঞ্চটার মধ্যে দ্বাঢ়িয়ে এ কথাটি
বলেছেন সেই মঞ্চটি বানাতে অনেক গুলো
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অবদান রয়েছে - যেনম
ধরুন তারকাটা, হাতুরী, বাটাল, বিভিন্ন সাইজ
করে কাটা কাঠ বা বাঁশ। কাঠ বা বাঁশ কাটা হয়েছে
সেই করাত বা মেশিন, হাত দা, তাছাড়া দড়ি, কাছি
ইত্যাদিতো রয়েছেই। অথচ এই প্রত্যেকটি এক
একটি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি

ব্যবহার করে পাওয়া জিনিস। সেই প্রত্যেকটা
বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে বা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার
করে পাওয়া জিনিসকে উনি ব্যবহার করছেন
অথচ বলছেন বিজ্ঞান মানেননা!

২.

ওই ভদ্রলোক গায়ে যে কাপড়টি পড়ে এসেছেন,
কোমরে যে ফিতাটি দিয়ে ওনার স্যালোয়ারটিকে
বেধে এসেছেন, শরীরে যে কাপড়টি পড়ে এসেছেন
সেই জোৰো, আল-খাল্লা, টুপি ওগুলো তৈরিতে
কত যায়গয় বৈজ্ঞানি প্রযুক্তি ব্যাবহার হয়েছ
বলতে পারেন? প্রথমে মাটি আবাদ, তারপর চারা
রোপন, গাছের পরিচর্যা, তুলা সংগ্রহ, তুলা
প্রকৃয়াজাত করে সূতা উৎপাদন, কাপড় উৎপাদন,
কাপড়ে রং করা, ফিতা দিয়ে ওনার মাপ নেয়া,
কাচি দিয়ে কাপড় কাটা, ম্যাসিনে সেলাই করা,
বুতাম তৈরির ক্ষেত্রেওতো একই রকম। পলিথন
উৎপাদন, পলিথন দ্বারা বুতাম তৈরি এবং
তারাপর সূজ-সূতা ব্যাবহার করে জামায় বুতাম

লাগানো বা মেসিনে জামায় বুতাম লাগানো। অথচ ওনি নাকি বিজ্ঞান মানেন না! তাছাড়া উনার পায়ে যে জুতাটি পড়েছেন সেটিতেও চামাড়া, কাপড়, আঠা, রাবার, প্লাস্টিক ইত্যাদি জিনিস ব্যাবহার করা হয়েছে। এই প্রত্যেকটি জিনিষ উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যাবহার হয়েছে। এবং জুতাটি তৈরি করতেও বৈজ্ঞানিক প্রকৃয়া ব্যাবহার করা হয়েছে। উনি জুতাটি পড়েছেন কিন্তু ওগোলো তৈরিতে যে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যাবহার হয় তার খবরও রাখেননা। আর সে লোকই হবেন আমাদের সমাজের মানুষের দিকনির্দেশক, এটা কি কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নেবে?

৩.

আপনি ওনার কাছাকাছি যদি আপনার নাকটিকে চালান করতে পারেন তাহলে আপনি বোঝতে পারবেন খুবই চমৎকার একটি সুবাস ভেষে আসছে ভদ্রলোকের শরীর থেকে। কারন উনি ওনার নবী সাহেবের মত একটি আতর মেখেছেন ওনার শরীরে যাতে সুগন্ধ ছড়ায় যতক্ষণ উনি

মাহফিলে থাকেন। এবার আপনি কী বলতে চান
ঐ গন্ধটি যে আতরের সেই আতরটিকি কোন
বৈজ্ঞানিক প্রকৃয়া ছাড়াই তৈরি হয়েছে?

8.

ড্রলোক নিশ্চয়ই কথাটি বলার সময় সাউন্ড
সিস্টেম ব্যবহার করছেন; ও, আপনারা নিশ্চয়ই
জানেন এক সময় ঐ হজুরেরাই ইসলামিক কোন
কাজে মাইক বা হর্নের ব্যবহারকে নাজায়েজ
করেছিল। সেই নাজায়েজই ধীরে ধীরে যায়েজে
রূপ নিয়েছে। এবং আজকাল শুধু যায়েজ
বললেই ভুল বলা হবে। আজকাল হয়ে উঠেছে
এটা হজুরদের দারি-টুপির মত ওয়াজ এবং
আজানের অনশিকার্জ একটি অঙ্গ। যা গোটা
মানব সমাজকে বর্তমানে শব্দ দূষননের ভীতির
দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এখন
নিয়ন্ত্রিত ভাবে মানুষ ব্যবহার করছে শুধু এশিয়া
মহাদেশের কয়েকটি দেশে ছাড়া। এখান কোথাও
ওয়াজ হলে অলিতে গলিতে পথে ঘটে মাইক

লাগায় গোটা পঞ্চাশেক। আর এটা দেখে পাশের
ওয়াজের আয়োজকরা মাইক আরো দশটা
বাড়িয়ে দেয়। সে ওয়াজের এখানে মানুষ যে
কজনই হয় হোকনা কেন! মানুষ শুনতে না
চাইলেও তাকে জোড় করে শুনতে বাধ্য করবে
ওরা। সেখানে হাসপাতাল-রুগি-পরিষ্কারী-শিশু-
বৃদ্ধ-বিরক্ত লোক যে যাই থাকুকনা কেন! আর
ওয়াজের যে জঘন্য ভাষা তা শুনতে বাধ্য হয় বাবা-
মা তাদের শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ আত্মীয়
পরিজন সবাইকে সাথে নিয়ে। অথচ কোন রা-
শন্দটিও করার ঘোগার নেই। গ্রামে হলেতো কোন
কথাই নেই। আর এ সাউন্ড সিস্টেমকে চালাতে
কতগুলো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কাজ করেছে তা কী
ওই ওয়াজকরী ডন্ডলোক জেনে কথা বলেছেন।
যেমন ধরুন - মাইক্রোফোন, তার (ক্যাবল),
মাইক্রোফোন থেকে গৃহিত কথা স্পিকিংয়ের
উপযোগী করার জন্য যথোপযুক্ত যন্ত্র, স্পিকার,
ব্যাটারি বা বৈদ্যুতিক প্রবাহ, স্ট্যান্ড। অথচ এর
প্রত্যেকটিই এক একটি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি। সেই
বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে উনি ব্যবহার করছেন অথচ

বলছেন তার বিপরীত কথা।

৫.

ঐ ড্রদলোক নিশ্চই হজ করেছেন বা হজে যাবেন;
হজে যেতে গেলে যে পাসপোর্ট লাগে তা উনি
জানেন। পাসপোর্ট বলতে একটি বিশেষায়িত বই
যেটা খুব সহজে অন্যকেউ বানাতে পারবে না।
এটা কি উনি কোন বৈজ্ঞানিক প্রকৃয়া ছাড়া পাবেন
বলে ভেবেছেন! আর পাসপোর্ট করতে যে উনার
ছবি লেগেছে তাও উনি জানেন। কিন্তু ছবি
তোলারতো স্বাধীনতা কোন মুসলমানের থাকার
কথা নয়। কারন ছবি তোলাতো হারম কাজ। তো,
হজে যেতে গেলে প্রথমেই উনাকে একটি হারাম বা
একটি নাফরমানি কাজ করতে হচ্ছে! তারপর
কিছু নিয়ম শ্রীঙ্খলা ফলো করে বিমানে চরতে হয়
তাও উনি করেছেন হজে যাবার আগে। কিন্তু
আপনারা কী জানেন বিমানে চরাও একটি
নাফরমানি বা এক সময়ে ওনাদের দ্বারা প্রচারিত
হারাম কাজ! তারপর সৌদি আরবে নেমেও কিছু
নিয়ম শ্রীঙ্খলা অনুসরন করে ঐ দেশে চুক্তে হয়।

এদেশ এবং ওদেশে যে নিয়ম শৃঙ্খলার কথা
বলেছি তার মধ্যে অনেক গুলো বৈজ্ঞানিক
প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে। উনাকে বাড়ি থেকে
এদেশের বিমান বলৱৎ নিয়ে যাওয়া ও ওদেশে
বিমান বলৱৎ থেকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে
হয়েছে। এখানেও কী ওনি গাড়ি ব্যবহার করেননি!
তো গারিকি কোন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি নয়! হজ
করতে উনি যেখানে যাবেন সেখানে যে
স্থাপনাগুলো তৈরি হয়েছে, হজ করতে গিয়ে ওনি
যেখানে থাকবেন সেখানে যে স্থাপনা তৈরি হয়েছে,
তাছারা ওনি এদেশে যে বাড়িতে ঘুমান, যে
টয়লেটে ওনি হাঙ্গ করেন ওনি একটু ভাবলেই
পাবেন সেখানেও অনেক বৈজ্ঞানিক প্রকৃয়ার
উদ্ভোত তৈজসপত্র লাগে তা তৈরি করতে বিজ্ঞান
শিখা ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রত্যেকটি
কাজের মধ্যে যে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কাজ
করেছে এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগুলোকে ব্যবহার
করে উনারা হজ নামক একটি মহাপূন্য অর্জনের
জন্য যাচ্ছেন অথচ কতগুলো পাপ করার পরে
সেটা সন্তুষ্ট হচ্ছে তা কী ওনি একবারও ভেবে

দেখেছেন?

৬.

ভদ্রলোক যে ওয়াজ করতে এসেছেন তা ওনি কী
কোন গাড়িতে এসেছেন নাকি পায়ে হেটে বা উটে
চরে এসেছেন? যদি পায়ে হেটে আসেন তাহলে
কোন কথা নেই। আর উটতো এদেশে নেই-ই। উনি
এসেছেন নিশ্চয়ই গাড়িতে চড়ে! অথচ গাড়িটিতো
বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি। তাহলে উনি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি
ব্যবহার করে এসেছেন অথচ বিজ্ঞানকে
মানছেননা। এটা কী কোন কথা হলো?

৭.

আমরা সবাই জানি, মিথ্যে বলা মহা পাপ। কি,
আপনি মানেনতো? ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস
করুনতো উনি এটা মানে কি না। তাহলে উপরে যে
বিষয়গুজলো আলোচনা করলাম তাতে কী মনে
হচ্ছেনা যে উনি মিথ্যে বলেছেন, মিথ্যে জেনেছেন
ও মিথ্যে জানিয়েছেন? তাহলে এখানে মিথ্যে বলা
কী মহা পাপ নয়? শুধু মোখে মিথ্যে বললেতো শুধু

১ জন, ২ জন, ৩ বা ৪ জন শোনে। আর এভাবে ওয়াজ করে মিথ্যে বলা হলে শোনতে বাধ্য হয় গোটা একটি সমাজ। এখন ইন্টারনেট আবিষ্কার হওয়ায় ফলে এক ভাষাভাষি প্রায় সমস্ত জনগনই তা শোনে। তাহলে এই মিথ্যে বলার অপরাধ মহা পাপের চেয়েও কতগুলি মহাপাপ হবে? অবশ্য ইসলামে নবী সাহেব একথার একটি উপযুক্ত জবাব আগেই দিয়ে রেখেছেন, আর ত হলো, ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য মিথ্যে বললে কোন পাপ নেই। এটা ওয়াজ কারীদের জন্য একটি অগ্রিম স্টিফিকেটের মতো কাজ করে।

৮.

আর ভাষার প্রসঙ্গ উঠলেতো আরেকবার গোড়ায় যেতে হয়। অর্থৎ বাংলা ভাষাটি এসেছে আর্য ভাষা -> সংস্কৃত ভাষা থেকে (<https://m.youtube.com/watch?v=wVi3RazO6o&feature=share>)। তার মানে বাংলা ভাষার মায়ের নাম হল সংস্কৃত ভাষা। আর সংস্কৃত ভাষায়ইতো হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থের লেখা

হয়েছে - আর তা লিখা হয়েছে নবীসাব পৃথিবীতে
আসার অনেক আগেই, অন্তত ইতিহাস তা-ই বলে।
তার মানে বাংলা ভাষার আদি উৎস হিন্দু
ধর্মাবলম্বিরা। তো, উনারা আল্লার দেয়া ভাষা বাদ
দিয়ে সাধারণ হিন্দু (বিশেষকরে) মানুষের তৈরি
ভাসায় কথা বলেন কেন? আল্লা বা নবীইতো
একথা বলেছেন যে আল্লার ভাষা হলো আরবি
ভাষা। তো আরবি ভাষা উনাদের শিখতে নিতে এত
সমস্যা হচ্ছে কেন? ভারতবর্ষে মুসলমান এসেছিল
৭০০ থেকে ৭৫০ বছর পূর্বে। উনারা কেন এই ৭০০
বা ৭৫০ বছরেও শিখে নিতে পারলেন কেন না
আরবি ভাষা? তাহলে নবী সাহেব বা আল্লা এটা
কি বললেন? উনিতো একথাও বলেছেন যে
অত্যন্ত সহজ ভাষায় উনি কোরান রচনা করেছেন।
অথচ আমরা প্রত্যেকেই শরীরে এখনো আঘাতের
চিহ্ন অনুভব করি যা হজুরেরা আরবি শিখাতে
গিয়ে উপহার দিয়ে ছিলেন। অথচ এখনো আমরা,
শুধু আমরা নই, আমাদেরকে শিখাতে যাওয়া সেই
সব হজুরেরাও আরবি ভাষার 'আ' ও বলতে,
লিখতে, পড়তে পারিনা। এই উপমহাদেশের

কমপক্ষে ২৪ টি ভাষার অন্তঃগত ধর্মান্তরিত
মুসলিমরা তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে কেন?
এখানে প্রকৃতির একটি কথা সবাইকেই স্বকার
করে নিতে হবে যে, প্রায় ১০০% লোকইতো তাদের
মাতৃ ভাষায় কথা বলে। কারন মাতৃ ভাষায় একটা
অকৃতিম টান থাকে যা সে অন্য ভাষা শিখে নিলেও
তার ঐ টানটি কোন দিনও যায়না। ওটা যাবার
নয়। কিন্তু এ সত্যিটি মেনে নিলে মুসলমানতো
আর মানুষ থাকেনা! কারন তাদেরকেতো আরবী
ভাষাই কথা বলা উচিত। আর এসবইতো মানুষের
তৈরী ভাষা। শুধুমাত্র আরবী ভাষাই হলো আল্লার
ভাষা। তারা যদি প্রকৃত মুসলমান হয় তাহলেতো
তাদের আরবি ভাষায় কথা বলা উচিত! যদি
তাদের পক্ষে আরবি বলা, বোঝা বা লেখা কঠিন
হয় তাহলেতো নবী বা আল্লা ভুল বলেছেন। আর
যিনি ভুল বলেন তিনি কি করে নবী বা আল্লা হন,
যে নবীর কথা হাদিসে ও আল্লার কথা কোরানে
পাওয়া যায়! আমি ভেবে পাইনা, জানেনতো! আর
আপনি নিজেও জানেন যে ভাষা হচ্ছে একটি
বিজ্ঞান। একটি বহুল ব্যাবহৃত বিজ্ঞান হচ্ছে ভাষা।

তাই এটিকে আর বিজ্ঞান বলেই আমাদের কাছে
মনেই হয়না। অথচ সে বিজ্ঞানকেই ওনারা নাকি
মানবেন না বলে ঠিক করেছেন!

আগেই বলেছি, বিজ্ঞান এখন এমন কিছু হয়ে
গেছে যে বিজ্ঞানকে আর না মেনে কারো পক্ষেই
বাঁচে থাকা সম্ভব নয়। বা বলা যায়, বাঁচালেও
তাকে আর কেউ মানুষ বলবে না, বলবে আদিম
মানব। আপনাদের ধর্মেও সেই লোকটিকে যে
বিজ্ঞান মানে না তাকে কখনো গ্রহন করবেন না।
কারন তাকে থাকতে হবে উলঙ্গ। সে কখনো কোন
কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না। কারন ম্যাসিন
ছাড়া কখনো কোন কাপড় তৈরি হয় না। আর
ম্যাসিন হল বিজ্ঞানের অনেক বড় একটি প্রযুক্তির
আবিষ্কার। অনেকে বলতে পারেন, আগেতো
ম্যাসিন ছিলনা, ছিল তাত, মাকু ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে
কাপড় বোনা হত। আমি তাদেরকে বলবো
আপনাদের এই মাকু ও মাকু ঘুড়িয়ে কাপড় তৈরি
করতে যেসব প্রকৃয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়
ওটাওকি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি নয়! একটু ভাল করে

ভেবে দেখুন, জেনে দেখুন।

আসলে ইসলামের ইতিহাসতো একটি খণ্ডিত
সময়ের ও খণ্ডিত উদ্যেশ্যের ইতিহাস, এর আগের
ও পরের এই সময়ের গোটা মানবের ইতিহাস যে না
পড়েছে সে আসলে এ পৃথিবী সম্পর্কে অনেক
কিছুই জানে না। জানি এ পৃথিবীর সবাই বোঝে
কিন্তু যে যার নিজের মত করে বোঝে। তবে
পৃথিবীর সবাই কিন্তু সব বোঝায় না। তবে যারা
বোঝায় আগে দেখতে হবে তারা কি বোঝে।
বলেতো দিলাম, দেখতে হব, কিন্তু দেখবেটা কে?
এদেশেকে যারা বোঝায়, এ দেশের জনগনকে
যারা বোঝায় তারাতো -

আগডুম বাগডুম ঘোরাডুম সাজে/
চাক চোল ঝাজর বাজে/
বাজতে বাজতে চললো চুলি/
চুলি গেল কমলা ফুলি/

তাই একথা বলাই যায়, ধর্ম মূলত বিজ্ঞানের আদি

সময়ের আবিষ্কার গুলোকে মেনে নিয়েছে এবং
পরবর্তী আবিষ্কার গুলোকেউ অনেকাংশে মেনে
নিয়েছে। শুধু যেগুলো মেনে নিলে সরাসরি ধর্মের
উপর আঘাত আসবে বলে মনে হয় সেগুলোকে এই
সময়ে মেনে নিলে ধর্মের ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে
মনে করেছে সেগুলোকে তখন প্রত্যাখ্যান করেছে।
তবে ধীরে ধীরে তাকেও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।
এবং ধর্ম অবশ্যই, অবশ্যই এবং অবশ্যই মনগড়া
একটি ধারণা। অবশ্য পরের আবিষ্কার গুলর মধ্যে
অনেক আবিষ্কারকে অবশ্য ধর্মাবলম্বীরা
অবলীলায় মেনে নিচ্ছে। এগোলোর ব্যপারে একটি
কথাও কিন্তু শোনবেননা কোনদিন। ওগুলোকে ধর্ম
নির্বাঞ্জাটে মেনে নেয়, মেনে নিতে নাধ্য হয়। যেমন
ধরুন কোন ঔষধের আবিষ্কার হলে কোন ধর্মীক
রূগিকে কি বলতে শুনেছেন যে, আমি এই ঔষধ
নেবোনা! সেটা হতে পারে গরুর, কচ্ছপের বা
শুয়ুরের শরীর নিসৃত ঔষধ। তবে ঔষধকে কিন্তু
এক সময় এদেশের হিন্দুরা মেনে নেয়নি। বলেছে
ম্লেচ্ছরা কি দিয়ে কি বানায় কিছু জানিনা। তা
খেয়ে আমার জাত খোয়াব না। দরকার হলে বিনা

ওষধেই মারা যাব। তবুও এ ল্লেচ্ছদের অবিষ্কার করা জিনিস খেয়ে নিজের জাত খোয়াতে পারবো না।

এছাড়া অন্যান্য অনেক অবিষ্কার আছে যেগুলো সম্পর্কে ধার্মীকণের কোন আপত্তি নেই। তবে বিজ্ঞানে পরিবর্তন একটি অনশিকার্য ঘটনা। কিন্তু ধর্মে পরিবর্তন একেবারেই অসম্ভব। তাইবলে বিজ্ঞান কখনোই ধর্মকে প্রশংস্য দেয়া না, দেয়ার কথা কখনো চিন্তাও করে না!

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধর্মের অবস্থান শূন্যও নয়। কারণ শূন্যেরও একটি অবস্থান আছে ধর্মের তাও নেই! অথচ ধর্মের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান তার চিরশক্ত! কিন্তু ধর্ম এখনো এমন কোন কথা বলতে পারেনি যাতে বিজ্ঞান তাকে শক্ত ভাবার মত মর্জাদা দিতে পারে। ধরুন বিজ্ঞান যদি একটি হাতি হয়, ধর্ম তাহলে একটি মশার চেয়েও ক্ষুদ্র প্রাণী। তবে মশাও কিন্তু হাতিকে বিরক্ত করে। তেমনি ধর্মও তার অনুশারিদেরকে বিজ্ঞান চেতনা থেকে দূরে রেখে

বিজ্ঞান আলোলনকে বাধার সম্মুখিন করে এবং
মানুষকে বিজ্ঞানের সুফল নিতে পিছপা করে গড়ে
তুলে। মানুষের বিজ্ঞান চেতনাকে এগিয়ে নেওয়ার
পথে বাঁধা দিয়ে বিজ্ঞানের চলার পথকে পিশ্চিল
করে দেয়। যাইহোক, যতই ধর্ম ধর্ম করেন না কেন
ধর্মগুলো বিজ্ঞানের নিরিখে চলতে বাধ্য। যদিও
ধর্মিকেরা এটা স্বীকার করতেই চান না। কিন্তু
ধর্মকে পাও দেয়ার মতো কোনো কারণ বিজ্ঞানের
আজ পর্যন্ত কোথাও ঘটেনি। কয়েকটি উদাহরণ
দেখলেই এই বিষয়টি পরিকার হয়ে যাবে
আপনাদের কাছে। যেমন -

১.

২০২০ সালে মকায় হজে গিয়ে হাজিরা জীবাণুমুক্ত
পাথর ছুড়েছেন শয়তানের উদ্যেশ্যে। এখানে
পাথরকে জীবাণু মুক্ত করতে অবশ্যই বিজ্ঞানের
কোনো সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানের সূত্র
না থাকলে পাথরকে জীবাণু মুক্ত করা যেতো না।
তাহলে মুমিনরা যদি শয়তানকে এতদিনের মত
পাথর মারতেন তাতে জীবাণু থাকতে পারতো এবং

তা থেকে মুসল্লিরা অসুস্থ হতে পারতেন। আর
করোনায় অসুস্থ হলে বোঝেনইতো যে কী অবস্থা
হতে পারে! তারমানে কী? বিজ্ঞানকে মেনে নিয়েই
আমরা ধর্ম-কর্ম করছিতো! অথচ বিজ্ঞানকে
স্বীকার করতে আমাদের এত ভয় কেন! আর
তাহলে সবচোয়ে গোড়ার কথাটি যে বলা হলোনা
আর তা হলো, আল্লা তাহলে কেমন পাওয়ারফুল
যে তার নির্দেশ মানতে গিয়েও মানুষকে মৃত্যুর হাত
হতে রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়!
আর বিজ্ঞান না হলেই মানুষ মরার আসন্ন থাকে!

২.

কল্পনা করুন এক সাধু বাবাকে। সাধু বাবার হাতে
যে মাটির কারুকার্য মণ্ডিত জিনিসটি, সাধু বাবার
গলার যে কয়েকটি হরেক রকমের মালা, বাম
পাশে রাখা ত্রিশূল, ত্রিশূলের গায়ে ঘোলানো
কয়েকটি মালা, পেছনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা
কতগুলো কাপড়, টেবিল সবই তো বিজ্ঞানের
আবিষ্কার। এই যে শিষ্যটি যে পোশাক পরে
দাঢ়িয়ে আছেন এ পোষাকটি, পায়ে জুতো

পড়েছেন এই জুতো জোড়া তার মধ্যে কোন
জিনিসটা বিজ্ঞান ছাড়া সম্পন্ন হয়েছে! কোনোটিই
নয়। অথচ বিজ্ঞানকে আমরা মেনে নিই না কেন!

৩.

ধরুন একটি মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্যাগোড়া বা
ধর্মীয় আরাধনার স্থান। এটাকে তৈরি করতে
একজন ইল্জিনিয়ার প্রয়োজন, তারমানে
বিজ্ঞানের সূত্র জানা প্রয়োজন। আমরা যত কিছুর
কথাই বলি না কেন, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা,
প্যাগোড়া, ঘরবাড়ি সবই বিজ্ঞানের অবদান। অথচ
আমরা সেই বিজ্ঞানকেই ঘৃণা করতে শিখছি ধর্মের
হাত ধরে। অথচ এ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে
আমাদের একদিন চলার বা এক রাত ঘুমাবার
ফুসরত নেই। আল্লা সুস্থির ভগবানকে যে ডাকবে
ডাকার স্থানটিও তৈরি করতে হয় বিজ্ঞানের
সহযোগিতা নিয়ে। কৈ আল্লা সুস্থির ভগবান গড়তে
নিজে বানিয়ে দিয়ে যায়না এই মসজিদ, মন্দির,
গীর্জা, প্যাগোড়া? এবং এসব নির্মানের সমস্ত
মালপত্র বা আসবাবপত্র ওগোলোওকি বিজ্ঞান

ছাড়া ধর্মের পক্ষে কি তৈরি করা সম্ভব ছিল!
কখনোই নয়!

৪.

একজন মানুষ একটি মূর্তি তৈরি করছেন। কোন পাথরটিকে কাটলে উপযুক্ত মানের মূর্তি গড়া সম্ভব, কী দিয়ে পাথর কাটলে মূর্তি বানানো যায়, কী দিয়ে মূর্তির চেহারা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তাও কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার। অথচ আমাদের চিন্তা-ভাবনায় বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মের গুরুত্ব বেশি পায়।

মূর্তি তৈরির কারিগর বা শিল্পীদের জানতে হয়েছে, কীভাবে একটি পাথর কাটলে সেটি কোন নির্দিষ্ট দেবতার রূপ পাবে। এই যে বিশেষ জ্ঞান, এটিই বিজ্ঞান।

৫.

আমাদের যে বই-পুস্তক, খাতা-কলম সবই তো বিজ্ঞানের অবদান। এত সুন্দর খাতা, কলম, পেন্সিল তৈরি করতেও বিশেষ জ্ঞান আর

অভিজ্ঞতার দরকার পড়েছে এটিই বিজ্ঞান।

কোরান, বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটক সবই কিছুতেই
বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। এসব গ্রন্থ লিখতে যে
কাগজ, কালির দরকার পড়েছে, এসবই বিজ্ঞানের
আবিষ্কার। অথচ ধর্মের ডামাডোলে বিজ্ঞান চাপা
পড়ে যায়!

৬.

এবার আশি বোরকার কথায়। মানুষ কাপড়
বানাতে শিখেছে এই তো সেদিন। কাপড় তৈরিও
হয় ঘন্টের মাধ্যমে। তার মানে কাপড়, সে যে কোন
ধরনের কাপড়ই হোক সবই বিজ্ঞানেরই আবিষ্কার।
তার মানে বোরকারও তৈরী বিজ্ঞানেরই হাতে নয়
কি? তাছাড়া বোরকার শিলাই, শিলাইয়ের সূতা,
বোতাম, চেইন ইত্যাদিওতো বৈজ্ঞানিক প্রকৃয়া
দ্বারাই তৈরী হয়। তবে কি আমরা বলতে পারিনা
যে ধর্ম মূলত বিজ্ঞনের তৈরী করা পোশাক পড়তে
উৎসাহিত করছে? যদিও মানুষকে এধরনের

পোষাক পড়িয়ে নির্যাতন করা হোক এটা বিজ্ঞান
কখনোই চাইতে পারেনা। মানুষের মনের কথা বলে
যে মনোবিজ্ঞান সে মূলত আশা করে মানুষ তার
ইচ্ছে মতো ও রুচিসম্মত পোশাক পরে বাইরে
বেরোবে, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারন মানুষের
লজ্জা নিবারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাপড়
আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে কেন মানুষকে বোরকার
মতো বস্তার মধ্যে পুরে রাখতে হবে! ওতে না
মানুষের স্বাধীন থকে না কোন সৌন্দর্য প্রকাশ
পায়! তাই বিজ্ঞানকে এত ছোট করার কোন কারন
কি আছে আমাদের জীবনে! মূলত বিজ্ঞানকে
ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারিনা!

৭.

হিন্দু সম্প্রদায়ের শিবলিঙ্গের কথাই ধরুন। এই
শিবলিঙ্গও তৈরি করা হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্র
ধরেই। কোন পাথর দিয়ে বানালে, কী দিয়ে
কাটলে, কত নিখুঁতভাবে বাটাল ও হাতুড়ি চালালে
একটি পাথর শিবলিঙ্গ বলতে যাকে বুঝে সেই
রকম রূপ পাবে, তা কিন্তু শিখিয়েছে বিজ্ঞান।

৮.

ধরুন বৌদ্ধধর্মের যুগল মূর্তি। যেখানে নায়ক-নায়িকা সেক্ষ্ম করছে। হ্যাঁ, মানুষ সেক্ষ্ম করে, এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এই সেক্ষ্ম করার ছবিটিকে পিতল বা কোনো একটি বস্তুকে কীভাবে গলিয়ে, কীভাবে ছাঁচে ঢেলে, কীভাবে রেখে এবং কীভাবে সেটাকে উন্মুক্ত করলে এই রকম একটি মূর্তি পাওয়া যাবে, সেটি কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার। তাছাড়া পিতল বা যে ধাতু দিয়ে এ মূর্তিটা তৈরি, সে ধাতুটাকে অন্যান্য ধাতু থেকে আলাদা এ পৃথিবীর কোথাও ছিল না। সেটাকে আলাদা করার প্রক্রিয়াটিও একটি জটিল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এই ধাতুটি সংগ্রহ করতেও একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এ দিয়েও তো বোঝা যায়, ধর্ম কতটা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল!

৯.

কাবার গায়ে ছোট একটি জায়গাটি আছে,

যেখানে প্রত্যেক হজকারীকে চুমু খেতে হয়।
আচ্ছা, এটি তৈরি করতে কি বিজ্ঞানের অবদান
নেই? অবশ্যই রয়েছে। যে ধাতু বা ধাতুর ঘোগ
দিয়ে এটা তৈরি, তা একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া
ছাড়া পাওয়া যাবে না। এসব ধাতু পৃথিবীর বিভিন্ন
জিনিসের মধ্যে মিশে থাকে। এ ধাতুগুলি একক
ধাতু হিসেবে পৃথিবীর কোথাও ছিল না। এগুলোকে
আলাদা করে একক ধাতু হিসেবে প্রকৃতি থেকে
আলাদা করা এবং কোন কোন ধাতু কি কি ভাবে
একসঙ্গে মেশালে এই নির্দিষ্ট ধাতুটি পাওয়া যাবে তা
ও মেশানোর প্রক্রিয়াটিও একটি জটিল বৈজ্ঞানিক
প্রক্রিয়া। তাছাড়া ওটিকে যথোপযুক্তভাবে
ডিজাইন ও যথাস্থানে যথোপযুক্তভাবে লাগানোতে
কি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নেই বলতে চান! এ
ধাতুটি সংগ্রহ করতেও একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার
মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে।

এ পৃথিবীর সমস্ত মৌলিক সিদ্ধান্তগুলোই বিজ্ঞান
নিয়েছে। যেমন-

ক.

হাতিয়ার বা অস্ত্র আবিষ্কার
একটু ভেবে দেখুন তো, কারো বাড়িতে যদি সাপ
ঢেকে আর এ খবর যদি কোনো প্রতিবেশী
জানতে পারেন, তিনি কি আর বসে থাকতে
পারেন! হোক তার প্রতিবেশী ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন
বর্ণের, ভিন্ন রংগের, ভিন্ন জাতির! তিনি তার হাতে
যুতসই একটি অস্ত্র নিয়ে না পেলে খালি হাতেই
চলে আসবেন। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ
দেখালাম।

আর যখন হাতিয়ারটি মানুষ আবিষ্কার করেছে,
তখনকার অবস্থা চিন্তা করে দেখুন। চারদিকে বন-
জল-জঙ্গল। তার মাঝে আপনারা দু'চার জন
মানুষ, তখন কি-ই না উপকার হয়েছে এ
হাতিয়ারটি দিয়ে! কিন্তু এটি যে আবিষ্কার করেছে
সেতো বিজ্ঞানকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে। জানি এটি
আপনি মামবেন না। কিন্তু এটি সত্য।

খ.

আগুন আবিষ্কার

আগুন ছাড়া মানুষ খাবার রান্না করতে ব্যর্থ। রান্না ছাড়া খেলেও যে মানুষ বাঁচবে না, তা নয়। কিন্তু রান্না ছাড়া কেউ কি খায় এই পৃথিবীতে! তাছাড়া আগুন অনেক কাজকেই মানুষের পক্ষে করা সহজ ও সম্ভব করে দিয়েছে। জানি এটিও আপনি মামবেন না। কিন্তু এটিও সত্য।

গ.

চাকা আবিষ্কার

একটি চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে সমস্ত জীবনের মোড়। ওই চাকার চাকায় চড়েই আজ পৃথিবীতে ছুটছে সবাই। লঞ্চ, স্টিমার, অ্যারোপ্লেন, মেশিন, ঘরি, ঘড়-বাড়িসহ অনেক কিছুই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে চাকা আবিষ্কারের ফলে। এটি কি বিজ্ঞান নয়?

তারপর ইলেকট্রিসিটি, ইলেকট্রনিকস, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোনাইল ফোন ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক অনেক কিছুই আছে

যা এ পৃথিবীর এমনকি ধর্ম প্রচারক পর্যন্ত ব্যাবহার না করে পারছেন না। তাই একথা কি বলা যায়না যে, যে যত বিজ্ঞানের বিরোধিতাই করি না কেন, আসলে আমরা বিজ্ঞান ছাড়া এক পাও চলতে পারি না। আসুন তো, একদিন ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে পরেরদিন ঘুম থেকে ওঠার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত একটু বিবেচনা করে দেখি।

একজন ছাত্রের জীবন চরিত-

a.

অ্যালার্ম দিয়ে রাখে যেন সঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠতে পারে। -- এজন্য সে এলাক্র ক্লক বা মোবাইল ফোন ব্যাবহার করে। অ্যালার্ম দেয়ার ঘড়ি বা মোবাইল ফোন -- এ দুটিই বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

b.

টয়লেটে যাওয়া। --

- টয়লেটে যে বদনাটি ব্যবহার করে, তা কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরি।

- পায়খানা শেসে যে সাবান দিয়ে হাত ধোয় তা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরি।
- যে ছোট ঘরটিতে টয়লেটে যায়, তা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরি।
- আমাদের টয়লেটের ময়লা যে পথে যায় ও যেখানে গিয়ে জমা হয়, তা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরি।
- যে দরজাটি খুলে ছোট ঘড়টি ডেতরে ঢুকে আবার বন্ধ করেছে, এখানে এই দরজাটি, কজাটি, যে হ্ক লাগিয়েছে, টান দেয়ার জন্য যে আংটা লাগিয়েছে, তার প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরি।
- যে প্যান্ট ও জাঙ্গিয়া খুলে টয়লেটে বসেছে, সেই প্যান্ট ও জাঙ্গিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরি।
- ওই প্যান্টের মধ্যে যে চেইন (জিপার), হ্ক, সেলাই করার সুই, বোতাম ইত্যাদি তার সবই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরি।
- বাথরুম থেকে বেড়িয়েইতো সে ব্রাস হাতে নেবে দাঁত ব্রাস করার জন্য, হাতে যে ব্রাশটা নিয়েছে, ব্রাশে যে পেস্টটা নিয়েছে তা এবং যেভাবে ব্রাশ

করছে সেই নিয়মটাও বৈজ্ঞানিক একটি প্রক্রিয়া।

C.

সকালের খাওয়া-দাওয়া -

- সকালের খাবার হিসেবে যে রুটি ভেজেছে, তা গম থেকে তৈরি করা হয়। এটি বৈজ্ঞানিক একটি প্রক্রিয়ায় চাষ করে, উপযুক্ত সময়ে কেটে, পরিষ্কার করে, শুকিয়ে, মেশিন দিয়ে ভাঙিয়ে, আগুন জ্বলিয়ে জল গরম করে, উপযুক্ত পরিমাণ জল দিয়ে ছেনে, রুটি বেলার পিড়ি ও বেলচা দিয়ে বেলে নিয়ে তা উপযুক্ত তাপে ভাজতে হবে। --
এখানে ১০টি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে।

- রুটি কী দিয়ে খাবে! মনে করি, ডাল-ভাজি।
আবারও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করে
পাকলে ডাল উঠিয়ে এনে, শুকিয়ে, গাছ থেকে
আলগা করে, আবার শুকিয়ে, ভেঙে, আবার
শুকিয়ে, মেশিনের সাহায্যে খোসা ছাড়িয়ে তারপর
ডাল খাওয়ার যোগ্য হয়। রাঁধতে লাগে লবণ।
লবণ উৎপাদন করাও একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

লাগবে পেঁয়াজ, মরিচ, তেল এবং সর্বোপরি
আগুন, যার প্রত্যেকটিই এক একটি বৈজ্ঞানিক
প্রক্রিয়া।

d.

স্কুল বা কলেজে যাওয়া --

- স্কুল বা কলেজে যেতে চাইলে বই, খাতা, কলম,
পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স, ব্যাগ, নিজের সাজসজ্জার
সমস্ত জিনিসপত্র, জামা, জুতা, চুল আঁচড়ানোর
চিরুনি, হাতের ঘড়ি, মোবাইল ফোন, সঙ্গে নেবার
টাকা, যাবার প্রয়োজনে রিকশা - গাড়ি, চোখের
সানগ্লাস ইত্যাকার জিনিশ আমাদের প্রয়োজন
হয়। তাছাড়া যে ঘরটি থেকে বেরুচ্ছে এবং
যেখানে গিয়ে উঠছে অর্থাৎ স্কুল বা কলেজ, যে
রাস্তাটি দিয়ে গেলেন বা প্রয়োজনে ছাতা নিলেন বা
রেইনকোট - ইত্যাকার বিষয়গুলো কি বিজ্ঞানের
অবদান ছাড়া তৈরি হয়েছে...! না। এখানেও যে
প্রায় ২০টি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে তা
কি আর বলা প্রয়োজন আছে?

আপনি যে মোবাইল ফোনে কথা বলছেন, গান
শুনছেন বা সিনেমা দেখছেন, ইন্টারনেট
চালাচ্ছেন, ফেসবুকিং করছেন, ওই ইন্টারনেটের
সংযোগ দিতে যে আকাশে স্যাটেলাইট পাঠাতে
হয়েছে যা বাংলাদেশও একটি পাঠিয়েছে।
ভারতের তো প্রায় সোয়া শ'র মতো আছে, এসব
প্রক্রিয়া কি বিজ্ঞান ছাড়া কখনো সম্ভব হতো বলে
আপনি মনে করেন...! ইন্টানেট যে প্রকৃয়ায় কাজ
করে তার নাম মাইক্রোওয়েব। আর এই
মাইক্রোওয়েব উন্নাবন করেছেন আপনার বাড়ির
পাশের বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। সেটাতো
আপনার জানার কথা!

e.

- স্কুল কলেজে যে শিক্ষা দেয়া হয়, মানুষকে শিক্ষা
দেয়ার এ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞান।
আপনারা হয়তো জানেন কোথায় কোন বাচ্চাকে
কিভাবে পড়ালে তার মধ্যে কোন জ্ঞানটা উপযুক্ত
মাত্রায় পৌছবে, কোন রকম জোর জবদ্ধি করা
হবেনা, আবার বয়সের তুলানায় হাল্কা শিক্ষাও

দেয়া হবেন। পরিষ্কা পদ্ধতিটিও আবিষ্কার
করেছেন একজন বিজ্ঞানি। পরীক্ষার পদ্ধতির
সূত্রপাত হয়েছে প্রাচীন চীনে সেই ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে।
১৮০৬ সালে ইংল্যান্ড এই পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ
করে এবং সরকারি বিভিন্ন কাজে প্রার্থী নিয়োগের
জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। পরবর্তীতে তারা
ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতির
সংযোজন করে। এইভাবে আস্তে আস্তে বিভিন্ন
দেশে পরীক্ষা পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশে
দেশে গ্রহণযোগ্যতাও পেতে থাকে। বিশ্বব্যাপী ছাত্র-
ছাত্রীদের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির সূচনা হয়।
তারপর চেয়ার, টেবিল, খাতা, কলম, পেন্সিল,
ইরেজার, শার্পনার, চাঁদা, ট্রিভুজ, পেন্সিল
কল্পাস, কাটা কল্পাস, জ্যামিতি বক্স, কলম দানী,
ফাউন্টেন পেন, বলপয়েন্ট পেন, ব্যাগ, এমন কি
শিক্ষক পর্যন্ত তৈরি হতে বিজ্ঞানের সহযোগিতা
লাগে। কাল শুচিলাম টিভিতে শ্রী কৃষ্ণের
বাল্যকাল দেখায় ওখানে বলা হচ্ছে - "সবই
ঈশ্বরের পরীক্ষা"। অথচ পরীক্ষা শব্দটির
আবিষ্কার হয়েছে ৬০৫ খ্রীস্টাব্দে। যখন এ ধর্ম

পুস্তকগুলো লিখিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়
তখন হয়তো পরীক্ষা শব্দটি কেউ জানতোই না!
তাই ভাবুনতো এত আগে পরীক্ষার কথাটি এই
ধর্মীয় বইয়ে কি করে সংযোজন করলো!

f.

রাতে যে খাট বা চৌকিতে ঘুমাতে ঘান, খাটে বা
চৌকিতে যে বিছানা পত্র, বালিশ তোষক চাদার
কম্বল বিছান, আপনার ঘড়ে যে টিভি, ফ্রিজ,
আলমারি, খাবার দানি, অন্যদের সাথে যুদ্ধ করার
জন্য যে সব বোমা, বল্দুক, পিস্তল, রাইফেল,
অন্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য ডাক, তার,
মোবাইল, ইন্টারনেট এবং সব চেয়ে প্রয়োজনিয়
যে জিনিসটি তা হলো টাকা এবং টাকা উৎপাদন
ও ব্যাবস্থাপনা পদ্ধতি এর সবই কিন্তু বিজ্ঞানের
আবিষ্কার। বর্তমান সময়ে যে যেই ধর্মই পালন
করুকনা কেন টাকা ছাড়া কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষই
যেন একেবারে অচল। অথচ টাকার চিন্তাটির
আবিষ্কার এবং টাকা আবিষ্কার কোন বৈজ্ঞানিক
আবিষ্কার নয় বলে আপনি নিশ্চয়ই দাবি

করবেননা!

উদ্ভবের সময় থেকে ধর্মগুলো আজ পর্যন্ত টাকা
অথবা টাকার সমতুল্য অর্থনৈতিক,
ক্ষমতাকেন্দ্রিক সাফল্য অর্জনকে উদ্দেশ্য করেই
মানুষ কৃত উদ্ভাবিত কগুলো নিয়ম শৃঙ্খলার
নাম। ধীরে ধীরে এসব নিয়ম শৃঙ্খলার অনেক
কচুই পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাও ধর্মগুলো
এখনো অন্ধকারের তীমিরেই রয়ে গেছে।

বিজ্ঞান আসলে কী?

আমরা সবাই জানি। তবুও একটু বলে নিই-
বিজ্ঞান হলো সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা, যেগুলো
সম্পর্কে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ
করে পাওয়া সিদ্ধান্ত বা জ্ঞান, যা আমাদের জীবনে
ব্যবহার করে আমরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করি।
গুগোল এর ভাষায় সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, বিশেষত
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাইকৃত
জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে। লললংল
ল্যাটিন শব্দ সায়েন্টিয়া (Scientia) থেকে

ইংরেজি সায়েন্স শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। বিশেষভাবে লঞ্চ জ্ঞান।

Science is a systematically organized body of knowledge on a particular subject. সমস্ত বিজ্ঞান কাঠো একার আবিষ্কার নয়। প্রথমে থেকেই বিজ্ঞান তখনকার সময়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের গবেষকদের দিয়ে আবিস্ফুল হয়ে আসছে। এখনো দিন রাত বিজ্ঞানের সাধনা করেই চলছে নতুন নতুন কিছু আবিষ্কারের। হয়তো পৃথীবিতে মানুষ যতদিন আছে তত দিন চলবে এই কাজকর্ম।

আর জীববিজ্ঞান অনেক কিছু জানে যা আমরা জানিনা। জীববিজ্ঞান জানে কি কি বিষয় একত্রিত হলে পরে জীবন সৃষ্টি সম্ভব। প্রান বা জীবনের সৃষ্টির পেছনে ছিল বারটি উপাদান বা factor; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -:

১. একধরনের প্রোটিন বা নিউক্লিয়টাইড (Nucleotide)
২. নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid)

৩. বিশেষ তাপমাত্রা এবং ৪. বিশেষ পরিবেশগত চাপ

এই চারটি, না শুধু এই চারটি নয়, মোট ১২টি উপাদানের মিলনে একদিন কোন এক মাহেন্দ্রক্ষনে উন্মেষ ঘটেছিল প্রথম প্রানের। অর্থাৎ অজৈব পদার্থ থেকে চৈতন্যময় জৈব পদার্থে উত্তরণ ঘটেছিল। আর এ উত্তরনের নামই হলো জীবন। ঘটেছিলো উল্লম্ফন। আপনি আমি সেই উল্লম্ফনেরই অনেক পরবর্তি প্রজন্ম, অনেক পরিবর্তিত বংশধর, অনেক বলতে আপনার আমার চিন্তার চাইতেও খুব বেশি বছর। কারন আমাদের চিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, জানেনতো। ততটুকু যতটুকু আমাদের মস্তিষ্কে ধরে। কিন্তু আপনিতো আমার বা আপনার মস্তিষ্ক সম্পর্কে খুব ডালই জানেন যে এ মস্তিষ্কের ক্ষমতা কতটুকু!

আর ধর্ম?

ধর্ম হলো, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাকে জ্ঞানী বলে
মনে করেছে কয়েক জন মানুষ, তার দ্বারা
নির্ধারিত কতগুলো নিয়ম-কানুন। অনেক সময়
জ্ঞানী মনে না করলেও তার আদেশ, নিষেধ মেনে
নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। অথবা কোনো একটি
বিশেষ নিয়ম-কানুন কোনো একদল (ছোট দল)
মানুষের কাছে ভালো লেগেছে। তারা ওই
নিয়মটির চর্চা করেছে। কালক্রমে নিয়মটি
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে -- এ রকম।

ধর্ম হলো, এমন একটি বিষয়, যা মানুষ
কোনোদিনও জানেনা অথচ তা জানতেও না চেয়ে
দ্বিতীয় কোনো সত্ত্বার হাতে তাকে সঁপে দেওয়া।
আর বিজ্ঞান হলো, সে বিষয়, যা প্রমাণিত।

এর শেষ কোথায়?

শুন্দ অশুন্দকে অথবা অশুন্দ শুন্দকে বুঝবে কবে?
- আমরা জানি এই দুই পক্ষ যদি একে অপরের
কাছে অকপটে নিজেকে তুলে ধরতে পারতো এবং
যে পক্ষের প্রকৃত দুর্বলাতা আছে সেটুকুকে বাদ

দিয়ে অপরপক্ষের ঘেটুকু ভাল আছে তাকে গ্রহন
করতো তাহলেইতো এই সংঘাতটি দূর হয়ে যেত।
হ্যাঁ, আসলেই তাই, এই দুই পক্ষ যদি একে
অপরকে পুরোপুরি বুঝতে পারতো তাহলেইতো
এই সংঘাতের আর প্রয়োজন হতোনা। এমনটি
হলেইতো মিটে যেত সব সংঘাত। আমি বলবো এর
একটি পক্ষ আপাত দৃষ্টিতে যাকে আমরা শুন্দ
চিন্তার পক্ষ বলছি সেই পক্ষটি কিন্তু অশুন্দ চিন্তার
পক্ষের মোটামোটি সব দিক সম্পর্কেই জ্ঞান রাখে।
কারন তারাও এক সময় অশুন্দ চিন্তার পক্ষের
লোক ছিল। অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষটি প্রথম পক্ষের
জানা-শোনা, বুঝা-বিবেচনার মধ্যেই তাদের সমস্ত
কাজ কারবার করে বেড়ায়। অপর পক্ষ যাকে
আমরা অশুন্দ চিন্তা চর্চার পক্ষ বলছি তারা কিন্তু
আপাত দৃষ্টিতে শুন্দ চিন্তা চর্চার পক্ষের জ্ঞান
গরিমার ধারে কাছেও পৌছাতে সক্ষম হচ্ছে না।
তাহলে এখন কি করনীয়! তাহলে কি শুন্দ চিন্তা
চর্চার চিন্তা করা বন্ধ করে দিতে হবে যাতে অশুন্দ
চিন্তা সাথে সমগ্রিতে চলতে পারে! এমন কথা
চিন্তাওতো কেউ করবেনা কখনো। কারন সেটা

হবে শুধ্য চিন্তা চর্চার জন্য আত্ম হত্ত্বার স্বামিল।

তো? এখন কি করতে হবে? এ জন্যইতো সরকারে শিক্ষা ব্যাবস্থার মত একটি সিস্টেম চালু হয়েছে। যাতে শুদ্ধ চিন্তা চর্চার বিষয়টি শিশু বয়স থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যায়। কিন্তু সরকার অর্থৎ সরকারী লোকজন যদি নিজেরাই সেটি না বোঝতে পারে তাহলেইতো সেখানে সমস্যা হয়। প্রত্যেকটি দেশকে অতি সচেতন ও শুচারুভাবে দেশের শিক্ষা ব্যাবস্থাকে সুনিপনভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কাজে কোন দেশ ব্যার্থ হলে কয়েক বছরেই সে দেশে দূর্ণীতি, ধর্মীয় সংঘাত, অপরাধ, অপকর্ম, অনাচার, অপরাজনীতি, অপসংস্কৃতি শুরু হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ কি এ কাজে সফল হয়েছে?

উত্তরে বলবো - না। মোটেও না। সফল নয় বরং চুড়ান্ত রূপে ব্যার্থ হয়েছে। বাংলাদেশ এখনো শিক্ষার আগায়ও পৌছতে পারেনি। গোড়াতো অনেক দূর। এদেশের শিক্ষা পদ্ধতির গোড়ায়

অনেক গল্দ আছে। ধর্মকে এরা আদর্শ জ্ঞান করে। ধর্মীয় কথাকে সব কথার উর্ধে রেখে তারপর এদের শিক্ষা দিক্ষা পরিচালিত হয়। ধর্ম এদের কাছে সবকিছুর উর্ধ্ব। এবং সে ধর্মকে এরা শিক্ষার চাইতেও বড় এবং অনেক বড় একটি উপাদান হিসেবে নিয়েছে। আর শিক্ষা ক্ষেত্রেও ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অথচ ধর্ম হওয়া উচিঃ মানুষের একান্ত বিশ্বাসের ব্যাপার। এ পৃথীবিতে যে রাষ্ট্রগুলো এখন সভ্যতম তারা কিন্তু ধর্মকে এমনভাবে বাজারে নামায়নি। আসলে মানুষ কি করবে না করবে তার সিদ্ধান্ত আসে চিন্তা থেকে। যার চিন্তা যত কল্পিত তার সিদ্ধান্ত ও পরিশেষে কর্ম বা কর্মপরিকল্পনাও তত বেশি অঙ্ককার। স্বচ্ছভাবে কোন কাজ করার বুদ্ধি বা সাহস এখনো কোন বাঙ্গালির গড়ে ওঠেনি।

কারন বাংলাদেশে এখন চারটা শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। এমনকি আত্মস্বীকৃত দেশদ্রোহীদের পর্যন্ত এরা সম-মর্যাদায় তাদের মতাদর্শ শিক্ষা দেওয়ার কাজে অর্থ খরচ করে যাচ্ছে। পৃথীবির উন্নত

দেশগুলোয় কখনো একথা কল্পনাও করা যাবেনা
যে দেশের সংবিধানের পরিপন্থি কাজ যারা করে,
তাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনা স্বমূল্ক কোন শিক্ষা
ব্যাবস্থা চালাতে কখনো সরকার টাকা খরচ
করবে, এমনকি তাদের শিক্ষা ব্যাবস্থাকে সে দেশে
চালাতেই দেয়া হয়না। বরং জোড় করে হলেও
তাদের মূল স্বৈতে উল্লে দেওয়া হয়, যেমন বর্তমান
সময়ে চিনদেশ ঠিক এই কাজটিই করছে। চিন
এখন পৃথীবিতে অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে
প্রধানতম দেশ। ওদের এই সমৃদ্ধি কিন্তু এমনি
এমনি আসেনি। অনেক কাঠ খর পুড়িয়ে তাদের
এই সমৃদ্ধি এসেছে। তাদের এই সমৃদ্ধি কিন্তু
সরকার একা নিয়ে আসেনি। প্রত্যেকটি লোককে,
প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আত্মসমৃদ্ধ হবার একটি পথ
করে দিয়েছে সরকার ফলে তারা নিজেরা
নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছে সর্বোরি গোটা দেশ
সমৃদ্ধ হয়ে গেছে। এবং যার জন্য আজ তাদের
দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। আর এদেশের
মোটজনগোষ্ঠির অর্ধেক নারীদেরকে সম্পূর্ণ বোকা
বানিয়ে এবং বাকি অর্ধেকের প্রায় অর্ধেক

পুরুষকে অর্ধমূর্খ বানিয়ে দেশের উন্যয়ন কি করে
সন্তুষ্ট সেটা কেউ বলতে পারেনা। এখানে আবার
একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, শুধুমাত্র
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধই প্রকৃত সমৃদ্ধি নয়। অর্থনৈতি
সমৃদ্ধিকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ও এর শঠিক
ব্যাহার নিশ্চৎ করার জন্য হলেও আত্মীক বা
মানবিক সমৃদ্ধি আগে দরকার। এদেশেও
তাদেরকে মূলশ্রেতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা
দরকার ছিল, প্রয়োজনে জোড় করেই তাদেরকে
মূলশ্রেতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা একান্তভাবেই
উচিত ছিল। সরকার তাতো করেইনি বরং তাদের
পিঠে বাতাস দিয়ে সরকারই তাদের বাতিকে
আরো বেশি প্রজ্জলিত করে দিয়েছে। একটি
সরকার যাচ্ছে, আরেকটি সরকার এসে হাওয়ার
পরিধী বাড়াচ্ছে। কিন্তু এরা এমনটা চিন্তা করছেনা
যে প্রকৃত পক্ষে এরা করছেটা কি? এরা নিজেকে
নিজের বিরুদ্ধে দ্বার করাচ্ছে। মানুষ আস্তে আস্তে
জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবার জন্যইতো শিক্ষা, এজন্য
মানুষকে ডিবিশ্বৎ চিন্তা করেই শিক্ষা নিতে হয়।
কিন্তু এরা ছেলেদেরকে বানাচ্ছে কুপমন্ডুক,

মেঘেদেরকে বানাচ্ছে অন্ধ। আসলে বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্যই এরা, মানে বাঙালীরা জানেনা, এবং জানা প্রয়োজন আছে বলেও এরা মনে করেনা। কারন এদের নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত প্রায় সবাই শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেনা। আর যারা বোঝে তাদেরকে এ সমাজ কোন মূল্যই দেয়না।

পৃথিবীতে বোধবুদ্ধি সম্পন্য মানুষের জন্ম কত বছর আগে তা জানা না গেলেও মানুষের বেঁচে থাকার ধরন ও মানুষের ইতিহাস দেখে বিজ্ঞানিরা অনুমান করে থাকেন প্রায় কয়েক লক্ষ বছর পার করেছে বুদ্ধিমান মানুষ এ পৃথিবীতে। সে প্রাচীন যুগের মানুষরা কি কোন ধর্মের অভ্যন্তরে ছিল! নাকি তাদের কোন ধর্মই ছিল না তখন! একটু ভেবে দেখলেই ধর্মের চাট্টি-বাট্টি গোল হয়ে যায় আপনা থেকেই। আমাদের মাঝে প্রধানত যে ধর্মগুলো এখনো তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে বা টিকে আছে তারাতো এসেছে অতি সম্প্রতি। যদিও এগুলোর মধ্যে অনেক ধর্মেরই কোন

ইতিহাস নেই। আছে কিছু গাল-গল্প আর বস্তা পচা
সন্তা বুলি। তবুও সেগুলোকেই সত্য ধরে আসুন
একটু ঘেটে দেখি ওগোলোর ইতিহাস। যেমন ধরুন

-

- ★. ১৪০০ বছর আগে ইসলাম ধর্ম ছিল না।
- ★. ২০২০ বছর আগে খ্রিষ্টান ধর্ম ছিল না।
- ★. ২৫০০ বছর আগে ইহুদীধর্ম ছিল না।
- ★. ৩০০০ বছর আগে শিখধর্ম ছিল না।
- ★. ৩১২০ বছর আগে জৈনধর্ম ছিল না।
- ★. ৩৫০০ বছর আগে আব্রাহামিক ধর্ম ছিল না।
- ★. ৪০০০ বছর আগে শিল্পাধর্ম ছিল না।
- ★. ৫৫০০ বছর আগে সনাতন ধর্ম ছিল না।

যদিও আদিম সময়ের মানুষেরা ধর্মমুক্ত ছিল বলে
মনে হয়না, তবুও এখানে যেসব ধর্মের কথা বলা
হয়েছে সেসব ধর্মইযে ছিলনা এটাতো নিশ্চৎ!
তো, এ ধর্মগুলো সবই ভূইফোড়, বিভ্রান্তিকর,
উদ্রুট, মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে
বাড়বাড়ন্ত ঘটানো কিছু আগড়ুম-বাগড়ুম

আয়োজন ছাড়া আর বিল্দুত্র কিছু নয়। এরা এমন অঙ্গ হয় যে এরা বিশ্বাষ করে ওদের দেশের চাইতে পৃথীবির উন্নত দেশগুলো অনেক ভাল, কিন্তু নিজেদের স্বভাব উন্নত করতে বললেই এরা ক্ষেপে যায়।

এজন্যই মাসুদুল হক তা মৌলবাদ বইটিতে বলেছেন -

"পরিবর্তন থেক, বস্তুর রূপান্তর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার নাম হচ্ছে মৌলবাদ। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার নামই হচ্ছে মৌলবাদ। পৃথিবী, জীব-জগত, মনুষ্য, সমাজের বিবর্তন নিয়ে অবৈজ্ঞানিক অঙ্গ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখাই হচ্ছে মৌলবাদ।"

ধর্ম যদিও মানুষের অঙ্গতাকে বাহন করেই তৈরি হয়েছে তবে ধর্মীয় ধারনাটি লুফে নিয়েছে প্রচন্দ পন্থী অপরাজনৈতিকরা। হ্যাঁ, আমি তাদেরকে অপরাজনৈতিকই বলবো। তারা মানুষের ভালো এক মুহূর্তের জন্যও চায়নি। চাইলে তারা মানুষের অভাব, অভিযোগ শুনে তাদেরকে নিশ্চিত মুক্তির

পথটি অবশ্যই দিতেন। তবে বর্তমান সময়ের
রাজনৈতিকরাও তাদের সেই ধারনাটি
আস্টেপিস্টে আয়ত্ত করে নিয়েছে। তাই তারাও
ধর্মীয় ধারনাটি থেকে মানুষ বেড়িয়ে আসুক তা
কেউ চাইছেনা। কারন তা চাইলে মূলত তাদেরই
রাজনৈতীক ফায়দা লুটায় কিছু সমস্যা হবে,
জনগন চতুর হয়ে যাবে। তারা যতই জনগনের
মঙ্গল কামনা করুকনা কেন, জনগন চতুর হোক,
অর্থৎ জনগন ধর্মের বাইরে বেড়িয়ে এসে তাদের
রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করুক এটা তারা কখনোই
চায়না। জনগন যত বোকা থাকবে, তারা রাজনীতি
করবো তত নির্বিস্তে, তত নির্বাটে, তত আয়েশে,
তত খায়েশে, তত নির্ভেজাল হবে তাদের ইচ্ছে মত
সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি তারা ও তাদের মাধ্যমে
সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ
অন্যান্য অনেক দেশের চাইতে এগিয়ে।

বাংলাদেশের সমাজ ও সামাজিক সংস্কৃতি যে
সামনের দিকে না এগিয়ে বরং পেছনের দিকে
পিছিয়ে গেছে এ দ্বায়টি মূলত কার?

এ দ্বায়টি মূলত নিতে হবে সরকারকেই। একটি
দেশের সরকার শুন্ধ হলে সে দেশে যত
অপসংকৃতিই থাকুক না কেন আস্তে আস্তে তা
দুরীভূত হয়। ভাল সংকৃতিগুলো উপযুক্ত পরিবেশ
পরিস্থিতি পেলে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে, ডালপালা
ছড়ায়। প্রয়োজনে নতুন কোন সংকৃতির সৃষ্টি হয়।
তবে খুব অল্প সময়ের ব্যাবধানে অপ্রয়োজনিয়
পুরাতন সংকৃতি উবে ঘায়না কিংবা ভাল নতুন
সংকৃতিও সৃষ্টি হয়না। আর এই যে বললাম উপযুক্ত
পরিবেশ পরিস্থিতি, এটা এখানে অবশ্যই অবশ্যই
এবং অবশ্যই খুবই প্রয়োজনিয় একটি উপাদান।
এদেশের ক্ষেত্রে ১৯৭৫ এর পরেইতো গনতান্ত্রের
সন্তানার অপমৃত্যু ঘটেছে। তারপর আর এদেশে
কোন সংকৃতি তৈরিতো দূরের কথা অপসংকৃতিই
তৈরি হবে এটাতো স্বাভাবিক ছিল। যতদিনে শেখ
হাসিনা ক্ষমতায় এসেছে তত দিনে এদেশ
মোটামুটি সভ্যতার অতলান্তে পৌঁছানোর আর
কিছু বাকি নেই। তাছাড়া শেখ হাসিনাওতো
পূর্বপাকিস্তানের, তার মানে পাকিস্তানের সংকৃতিতে
গড়া একটি মানুষ। তার নিজের শিক্ষা সংকৃতি

এবং তার সাথে যারা রাজনীতি করে তাদের শিক্ষা
সংস্কৃতিতো এদেশের ঐ অপসংস্কৃতিকে বয়ে
বেড়ানো মানুষদেরই মতো হতে বাধ্য। কারন
তারাওতো পাকিস্তান ও ক্ষয়িস্তু বাংলাদেশের কাছ
থেকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির বোধটুকু পেয়েছে।
তাদের কাছ থেকে এ ক্ষয়িস্তু সমাজকে পুনরুদ্ধার
করায়ে কতটুকু সন্তুষ্টি সেটা না ভাবলেও
অনেকাংশই বলে দেয়া যায়। তাছাড়া এদেশযে
আগে পাকিস্তান ছিল এটা ভুলে গেলেতো
চলবেনা! তাই প্রকৃত পাকিস্তানের সমাজ সংস্কৃতি
এখন আমরা যা দেখছি, বাইরে থেকে ঘেটুকু দেখা
যায় তাতে তো সংশয় জাগে মনে, এদেশ না
আবার পাকিস্তানে পরিনত হয়ে যায়? মানে
পাকিস্তানের মত হয়ে যায়! অথবা আবগানিস্তান!
তবে একটু আশার কথা আছে। আর তা হলো,
জীবনের প্রয়োজনে শেখ হাসিনা অনেক উন্নত
দেশে থেকেছেন, উন্নত সংস্কৃতি দেখেছেন। তার
পক্ষে হয়তো সন্তুষ্টি ছিলো এদেশের সংস্কৃতিতে
কিছু অন্তর পরিবর্তন আনা। কিন্তু সেরকম কোন
পরিবর্তন উনি আনতে পেড়েছেন কী? কারন উনি

যতই উন্নত দেশে যান না কেন উনিতো একটি
বাঙালি মেয়ে হয়ে উন্নত দেশে গিয়েছেন। উনিতো
প্রধানত ঘড়ের কোনে থাকতেই পছল করবেন।
তাই উনার পক্ষে সেইরকমভাবে কোন পরিবর্তনও
সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে অদর্শিক উন্নয়নতো
একেবারেই হয়নি।

##

কেউ যখন বোধ বুদ্ধি গজাবার আগে ক্ষমতাবান
হয়ে যায় সে হয় সাধারণত উগ্র, অত্যাচারি নেতা।
আর যাদের বোধ বুদ্ধি গজাবার পরে আসল
সত্যিটা বুঝে নিয়ে ক্ষমতাবান হয় সে হয় প্রকৃত
পক্ষে ভাল মানুষ। এখন বলতে পারেন অনেক
শিক্ষিত লোকও আছে, যারা শিক্ষিত তারাতো
বোধ-বুদ্ধি গজানো মানুষ, তাহলে তারা খারাপ হয়
কেন? শিক্ষিত হলেই কিন্তু সে বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন
মানুষ হয়না। বলতে পারেন শিক্ষা হলো মানুষকে
বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার সহায়ক শক্তি। কিন্তু
শিক্ষা না থাকলেও মানুষ বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ
হতে পারে। গভীর চিন্তা মানুষকে বোধ দেয়, আর

শিক্ষিত লোকদের জন্য এটা সহজ হয় কারন
তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির আগেই অনেক
রকম বিষয় নয়ে চিন্তা করার ফুসরত পায়। বিভিন্ন
ক্লাসে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরা চিন্তার চর্চা করে।
এসব চিন্তার চর্চাগুলো যেসব ছাত্র-ছাত্রি সত্যি
সত্যিই করে যায় তারা এক সময় ডাল মানুষরূপে
সমাজকে মহিমাষ্ঠিত করে। কোননা কোন ভাবে
সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর যারা ফাঁকি
বুকি দিয়ে নিজের ছাত্র জীবন পার করে যায়
তারা সমাজের কোন ডাল কাজে লাগেনা। হতে
পারে তারা এক সময় অনেক বড় কেউ কেটা হয়ে
গেল, কিন্তু এয়ে বললাম, বোধ-বুদ্ধি গাজানোর
ব্যাপারটি, এখানেও ঐ একই ঘটনা ঘটে। অনুন্নত
দেশ বা উন্নয়নশীল দেশে এদের সংখ্যা প্রচুর। তবে
এদের মধ্যে অপরাধ প্রবনতা বেশি, এরা অনেক
সময় মারাত্মক অপরাধি হয়, এরা পরশ্রীকাতর,
ঈর্ণা পরায়ন হয়, অপরাধ সংঘটনে অত্যন্ত চতুর
হয়, অতিশয় নিপুনভাবে এরা অপরাধ করতে
পারে। দেশ যত উন্নত হবে এদের সংখ্যা তত কমে
আসবে। তবে সে উন্নয়নটি হতে হবে অবশ্যই

মানসিক উন্নয়ন, শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে এ
শ্রেণিটির প্রভাব কমবেতো না-ই, বরং আরও
বাড়বে। এই যেমন বাংলাদেশে এখন বাড়ছে। এরা
শুধু স্বার্থ দেখে কাজ করে। বিচার্য বিষয় অথবা
যুক্তির ধারও এরা ধারেন। এদের সংখ্যাই
বাংলাদেশে এখন প্রকট। সাধারণত এরা হয়
ব্যাবসায়ি। ব্যাবসার জন্য এরা রাজনীতিকে পন্য
বানায়। আর পন্য বানায় মানুষের আবেগকে। আর
প্রকৃত রাজনৈতিক নেতাকেউ খেলতে হয় মানুষের
আবেগ নিয়ে - প্রতিনিয়ত, অনবরত, লাগাতার,
একটির পর একটি, সেটা মানুষের ভালুক জন্যও
হতে পারে, হতে পারে খারাপের জন্য। আর
সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূর্তির
মধ্যে কোরান রেখে যে নাটক, নডেল, উপন্যাস
করা হলো, হতে পারে এ কাজটি আওয়ামিলীগ,
বিএনপি, জাতিয়পার্টি বা জামায়াত করেছে কিন্তু
করেছেতো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ঠিক
আগে। ইলেকশনতো এবার হবে জাতিয়
রাজনীতির মার্কা নিয়ে। আর তাই যে কেউ মানে
আওয়ামিলীগ, বিএনপি, জাতিয় পার্টি, জামায়াত

বা দুই বা ততোধীক দল যৌথভাবে অথবা কোন মৌলবাদী গোষ্ঠী এ সুযোগটি নিতে পারে তাদের বক্তৃতায় যোশ আনার জন্য, এদেশ থেকে বিধমীদেরকে (ওরা এদেরকে বিধমীই বলে) এদেশ থেকে তাড়ানোর জন্য, তাদের সম্পদ আত্মস্বাতের জন্য, এখন কেউ স্বীকার না করলেও এটাতো সত্যি এদেশের সিংহভাগ মুসলিমই অত্যন্ত দরিদ্র ছিল, তারা অন্যের সম্পদ বিভিন্নভাবে লঞ্চ করেই ধনী হয়েছে। তেমনই লোভ দেরকে তারা করে ফেরে প্রতিটিখন। এই জন্যইতো তিনজন বিধমী বাড়িতে আগুন দেয়া লোকেরে পুরস্কৃত করেছিলেন স্থানিয় সরকার নির্বাচনে নমিনেশন দিয়ে। পরে বিষয়টি দেশময় ছড়িয়ে পড়লে ওদেরকে প্রত্যাহার করা হয়। হলেইবা কি? ধানা কমিতো ওদেরকে জেনে শুনেই এভাবে পুরস্কৃত করেছে। ধানা কমিটিতে এমনতো কেউ ছিলনা যারা এই সৎ কর্মের কথা জানতোনা। যদি তাদের কেউ অস্তীকার করে যে তারা এই বিষয়টি জানতোনা তাহলে বলবো তারা কেউ এদেশেই থাকেন না। বিদেশে থাকেন। তাহলেতো কথা

উঠবে, বিদেশে থাকলে সে আবার থানা কমিটিতে
থাকে কি করে? আর এমন একটি ঘটনা যা
বাংলাদেয়ের প্রায় সব নাগরিক জানে, তাই
বিদেশে থাকলেও তার জানার কথা। তো
তাদেরকি কোন বিচার হয়েছে? নাকি তাদের নাম
প্রত্যাহার করে একটু আই ওয়াস করা মাত্র! তবে
তাদেরকে যে পুরস্কৃত করার রেওয়াজ বাংলাদেশে
আছে এটাতো প্রমান হয়েই দ্বাড়িয়ে গেল।

এরকমভাবে চলতে থাকলে মুসলিম আইনের
দেশে পরিনত হতে খুব বেশি দেরি নেই
বাংলাদেশে। মাত্রতো আর ক'টা দিনের অপেক্ষা
মাত্র। অথচ মুসলিম আইন সম্পর্কে এদেশের ৯৫
ভাগ মানুষই এখনো কিছু জানেনা। ওটা যে কি
এক ঘেড়, কি বিশ্বী এক টোপ কখনো এদেশের
মানুষ শোনলেও কষ্ট পাবে। আর এদেশে যদি
ইসলামি আইন চালু হয় তাহলেতো ওরা পালিয়েও
বাঁচতে পারবেনা। মোল্লাদের মাথায়তো ছোটবেলা
থেকেই কিছু ছিলোনা, এখনও নেই, যার জন্য ওরা
স্কুলের শিক্ষার উপযোগী ছিলনা, বিশেষ করে এই

জন্যই ওদেরকে এই মাদ্রাসা নামক আস্তাবলে বেঁধে
পড়ানো হতো। ওদের সীমাবদ্ধ চিন্তা শুধু
সীমাবদ্ধতাকেই আহ্বান করবে এটাই স্বাভাবিক।
তাই বলে আপনারাও কি এই সীমাবদ্ধ চিন্তার
পেছনে শুধু কথায় জালে আটকে অন্তসার
শুন্যতার পরিচয় দিবেন? নাকি নিজেদের ডাবনার
মূল্যয়ন করবেন।

এদেশে এখন প্রথার বাইরে যে যাবার সাহস রাখে
তাদেরকে রাজনীতিতে নামতে হবে। হ্যাঁ, এখনি
নামতে হবে। না হলে প্রথার কাছেই আমাদেরকে
অনেকদিন মাথা নত করে থাকতে হবে। না হলে
আমাদের রাজনৈতিক অধীকারগুলোও ঠিকমতো
পাবনা। এখনো আমরা অনেক রাজনৈতিক
অধীকার থেকে বচ্চিত। দেখেনতো ইসলাম ছাড়া
অন্যধর্মালম্বীদের কি করুন অবস্থা! ওনাদেরকে
এদেশ থেকে জোর করে বের করে দিতে পারলেই
যেন মুসলিমরা শান্তি পায়। ওরা যাদেরকে বিধর্মী
বলে স্বাধীনতার পরে তাদের হার কত শতাংশ
ছিল, আর এই ৫০ বছরে তাদের হার কত শতাংশে

নেমে এসেছে! এটি দেখলেই পরিষ্কার হতে বাধ্য যে এ ৫০ বছরে তাদের প্রতি কত অবমাননা করা হয়েছে। এদেশে এখন চলছে বোরখার রাজনীতি ও বোরখা পড়া রাজনীতি।

তবে যে কথাটি বলে নেয়া ভাল, বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে, শেখ মুজিব এদেশ স্বাধীন না করে গেলে আজও এদেশকে পরাধীনই থাকতে হত। তাই সেলুট শেখ সাহেব।